লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ■ ১৮তম সংখ্যা
১৭ চৈত্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ ■ ১১ রবিঃ আউঃ, ১৪২৮ হিজরি
৩১ মার্চ, ২০০৭ ঈসাব্দ

২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা, রাজ
2nd Regional Salana Jalsa, Rajs
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেবাড়ীয়া, নাটোর,
Ahmadiyya Muslim Jama't, Tebaria, Natore, 16

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

বয়'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আঃ) লুধিয়ানা থেকে বয়'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রচারিত এক ইশতেহারে লিখেন ঃ

"বয়'আতের এই সিলসিলাহ বিশেষভাবে **'বর মুরাদ ফর আহেমী–তো'এফাহ্ মুত্তাকী'** অর্থাৎ খোদাভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদেরকে জামাতে সংঘবদ্ধ করার জন্য, যাতে খোদাভীরুদের এমন বড় এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের নেক প্রভাবের বিস্তার ঘটায় এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী শুভ পরিণামের কারণ হয়। ওই কল্যাণমণ্ডিত একত্ব প্রকাশক বাক্যের উপর সমবেত হওয়াটা, ইসলামের পাক-পবিত্র ও সম্মান পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সেবায় দ্রুত সফলতা আনতে পারে, যাতে এক মুসলমানকে পীড়িত, নিষ্পেষিত, কৃপণ, পরাভূত ও পর্যুদস্ত মুসলমানে পরিণত হতে না হয়। এরা অমন অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতবিরোধিতা ও অনৈক্যের কারণে ইসলামের বিরাট ক্ষতি করেছে, এর (ইসলামের) অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কলঙ্কের কালিমাপূর্ণ দাগ এঁকে দিয়েছে। আবার এমন অকর্মণ্য সাধু সন্যাসী বা নির্জনবাসী ঘুরকুণোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ আপনজনদের প্রতি সহমর্মিতার কোন বালাই নেই আর যাদের মানব-সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষান্তরে এরা অর্থাৎ বয়'আতকারীরা হলো এমন জাতি, যারা গরীবের আশ্রয়স্থল, এতীমদের জন্য বাপের মত ও ইসলামের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহায়তা দিতে একান্ত প্রেমিকের মত আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনা এ উদ্দেশ্যে করে, যেন এর (ইসলামের) সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করে আর ঐশীপ্রেমে ও খোদা তাআলার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ ধারা প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে একস্থানে মিলে গিয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়..........খোদা তাআলাই এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শন করতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর, এদেরকে উন্নতি দান করতে চাইছেন যাতে পৃথিবীতে মহব্বতে ইলাহী (পরম উপাস্যের প্রতি ভালবাসা), তওবা নুসুহ (আন্তরিক অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে প্রত্যাবর্তন), পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানব সন্তানের জন্য মায়া মমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়া যায়। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে, তিঁনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ বাণী দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা যোগাবেন, তাদের নোংড়ামী পূর্ণ জীবন ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দান করবেন। তিঁনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই দলকে তিঁনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবেশ করাবেন। তিঁনি এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং এতে প্রবৃদ্ধি দান করবেন এতটা যে, গণনায় তাদের আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা ওই প্রদীপের মত, যা উঁচুতে স্থাপিত হয়ে দুনিয়ার চারপাশে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়। এভাবে ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিঁনি এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদের প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের উপর বিজয় দান করবেন। সর্বদা, কেয়ামত কাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। ওই **'রাব্বে জলিল'**-ই এটা চেয়েছেন, তিঁনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান, করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।" (তবলীগে রিসালত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে ১৫৫)

এ মহান উদ্দেশ্য কার্যকর করতে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টিত থাকবো মসীহ্ মাওউদ দিবস (২৩ মার্চ) পালনের এ মাসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

তৌফিক 'আলা ইল্লা বিল্লাহ।

---

৩১ মার্চ, ২০০৭

সূচীপত্র *পৃষ্ঠা নং*

- পবিত্র কুরআন ৪
- হাদীস শরীফ ৫
- অমৃতবাণী ৬
- জুমুআর খুতবা ঃ ----"প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, সোচ্চার হওয়া এবং খোদা তাআলা ও ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে মানুষকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা।" ৭-১২
  হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ : বাংলাডেস্ক, লন্ডন
- জুমুআর খুতবা ঃ ----"আল্লাহ্ তাআলার রহ্মান বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা" ১৩-১৮
  হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ : বাংলাডেস্ক, লন্ডন
- জীবন্ত খোদার অস্তিত্ব ও তার প্রমাণ ১৯-২৬
  মাওলানা ইমদাদুর রহমান ছিদ্দিকী
- আলেজান্ডার ডুইর শহর 'যিয়ন'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট– ২৭-২৮
  শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (পলাশ)
- উকিলে আলার দপ্তর থেকে ২৯
  অনুবাদ ঃ বশীর উদ্দীন আহমদ
- সুরভীত এক ফুল মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ) ৩০-৩২
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- পর্দা ঃ নারীর মর্যাদার প্রতীক ৩৩-৩৬
  আহমদ তবশির চৌধুরী
- জামাত সমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ ৩৭-৪১

প্রচ্ছদ ঃ ২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা ২০০৭ রাজশাহী-২ অঞ্চল, তেবাড়িয়া, নাটোর।

ছবি ঃ কোরাইশী মোহাম্মদ মাসুদ

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

৩৮। আর এ কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা বানিয়ে নেয়া যেতে পারে। বরং এটি এর পূর্ববর্তী (শিক্ষা)-র সত্যায়ন এবং বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের সেই বিধানের[১২৬১] বিস্তারিত বিবরণ, যাতে কোন সন্দেহ নেই।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٨

৩৯। এরা কি একথা বলে, 'সে এ (বাণী)-কে নিজে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত একটি সূরা বানিয়ে আন[১২৬২], আর আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পার (এ কাজে সাহায্য করতে) ডেকে নাও।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٩

৪০। প্রকৃতপক্ষে, যে বিষয়ের জ্ঞান এরা আয়ত্ত করতে পারেনি এবং যার তাৎপর্য এদের কাছে এখনও প্রকাশিত হয়নি। এরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এদের পূর্ববর্তীরাও একইভাবে (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব চেয়ে দেখ, যালেমদের কী পরিণতি হয়েছিল!

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠

[১২৬১] এ আয়াত পাঁচটি অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছে যে পবিত্র কুরআন, আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ (ক) এর বিষয়-বস্তু এমন যার জ্ঞান মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং যা একমাত্র আল্লাহই প্রকাশ করতে পারেন, (খ) পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা এ প্রমাণ বহন করে যে এর উৎস আল্লাহ্ তাআলা, (গ) পূর্ববর্তী কিতাবের শিক্ষাকে কুরআন এরূপ স্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা বা বোধগম্য করেছে, যা অন্য কোন কিতাবই করেনি, (ঘ) কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ এরই মাঝে সন্নিবিষ্ট এবং বাইরের কোন ব্যক্তি বা কিতাবের সাহায্য বা সমর্থন, এর সত্যতা নিরূপণের জন্য অনাবশ্যক, (ঙ) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মোকাবেলায় এ পবিত্র কিতাব সকল অবস্থায় সকল মানুষের নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ করে।

[১২৬২] এ আয়াত কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কুরআন শরীফের মত পরমোৎকর্ষপূর্ণ কিতাব যদি মানুষের জালিয়াতি হতে পারে, তাহলে এর মত একটি গ্রন্থ তারা নিজেরা প্রণয়ন করে না কেন? এ চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য অক্ষুন্ন হয়ে রয়েছে। দেখুন ৪৪নং টীকা।

হাদীস শরীফ

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

["এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও, যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সাথে মিলিত হয় নাই।" (সূরা জুম'আ-৪)]

উপরোক্ত আয়াতের অবতরণ সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলিয়াছেন ঃ–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاُنْزِلَتْ
عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ "وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ" قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَاَلَ ثَلَاثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهٗ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ
رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰٓؤُلَاءِ
(بخاری کتاب التفسیر)

"আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। তখন সূরা জুমুআ' যাহার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত আছে, অবতীর্ণ হইল। বর্ণনাকারী বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাহারা কে (যাহারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হন নাই)? কিন্তু তিনি (সাঃ) ইহার কোন উত্তর দেন নাই, এমন কি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, 'ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের (পারশ্য বংশোদ্ভূত) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হইতে উহাকে নামাইয়া আনিবে'।"

(বুখারী-কিতাবুত-তফসীর, ২য় খন্ড ১৯৩২ ইং সনে মিশরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)।

উপরোক্ত হাদীস ও পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হইতেছে যে, দুনিয়াতে যে যুগে প্রকৃত ঈমান থাকিবে না তখন পারশ্য বংশীয় বিশেষ ব্যক্তি দুনিয়াতে ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি হইলেন ইমাম মাহদী (আঃ) বা প্রতিশ্রুত মসীহ্। বস্তুতঃ ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পারশ্য বংশীয় এবং তাঁহার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত রূহানী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মহা সুসংবাদ পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা নং ৭-৮)

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হে বুদ্ধিমানেরা ! খোদা তাআলা এ প্রয়োজনের সময় এবং গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নাযিল করেছেন। আর সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য, বিশেষভাবে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য হযরত 'খায়রুল আনামের' [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর] জ্যোতিঃ বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর এক দাসকে জগতে পাঠিয়েছেন। এতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী সেই খোদা, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষা সংরক্ষণ করবেন। এবং একে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হতে দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি তিনি এ অন্ধকার দেখে এবং ভিতর ও বাইরের বিপদ-আপদ পর্যবেক্ষণ করেও চুপ থাকতেন এবং তাঁর বাণীতে জোরালো ভাষায় বর্ণিত নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন, তবে তা-ই হতো আশ্চর্যের বিষয়। আমি আবার বলছি, যদি এ পবিত্র রসূলের এই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো, যাতে তিনি বলেছেন, **“প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তাআলা এরূপ বান্দাকে সৃষ্টি করতে থাকবেন যিনি তাঁর ধর্মকে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করবেন**, তবে তা-ই হতো বিস্ময়ের ব্যাপার ......

অতএব এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, খোদা তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিটও বিলম্ব হতে দেননি। বরং তিনি অনাগত কালের জন্য যে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী ও অসাধারণ ঘটনার দুয়ার খুলে দিযেছেন, তা হাজার হাজার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মূল ও বিশ্বাস বাড়ানোর সুযোগ। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক সেজদা কর। কেননা যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের সম্মানিত বাপ-দাদাগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত আত্মা যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গেছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছ। এখন এর কদর করা বা না করা এবং এথেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। একথা আমি বারবার বলবো এবং এ ঘোষণা থেকে আমি কখনো বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে ধর্মকে সজীবভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। [অনুবাদকৃত ফতেহ ইসলাম পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

“প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, সোচ্চার হওয়া এবং খোদা তাআলা ও ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে মানুষকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা।”

সৈয়দনা আমীরুল মুমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টস্থ্ বাইতুস্ সুবুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২২শে ডিসেম্বর, ২০০৬ (২২শে ফাতাহ্ ১৩৮৫ হিজরী শামসি) জুমআর খুতবা।

জার্মান একটি কর্মঠ জাতি। যদি আজকের আহমদীরা নিজেদের তবলীগী দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেন তাহলে এ জাতি একটি বিপ্লব সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

প্রত্যেক আহমদী আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী বই পুস্তক বিতরণ করতে হবে এবং সাধারণ তবলীগী বই পুস্তকও প্রত্যেক জার্মানবাসীর কাছে পৌঁছাতে হবে। সময় সুযোগ অনুযায়ী সকল সাংসদ, মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ্ কর্মকর্তা, প্রত্যেকটি সংবাদপত্র সহ বিনাব্যতিক্রমে প্রত্যেক নেতা এবং শিক্ষিত সমাজের কাছে আহমদীয়াত এবং ইসলামের সত্যিকারের পরিচিতি তুলে ধরুন।”

আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই বিরোধিতা এবং ধর্মের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম বক্তা সাব্যস্ত হয়ে ইসলামের প্রকৃত মুক্তির বাণী স্বদেশের ছোট-বড় প্রত্যেকের কাছে পৌঁছান, আজ এটিই সবচেয়ে বড় মানব সেবা।”

{পাশ্চাত্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ বৈরিতাপূর্ণ অপপ্রচারের প্রেক্ষাপটে জামাতের উদ্দেশ্যে একান্ত জোরালো উপদেশ।}

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা’দু ফাউযু বিলাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর্ রহ্মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস্সিরা তাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

বর্তমানে পাশ্চাত্যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ বিরোধিতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অনেকে প্রকাশ্যে আর অনেকেই বাহ্যত: মুসলমানদের দরদী সেজে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন কাল্পনিক দূর্বলতা চিহ্নিত করে বলে যে, এর উপর অনুশীলন সম্ভব নয়। অপরদিকে এমন একটি শ্রেণীও আছে যারা ধর্ম বিরোধী হওয়ার কারণে ইসলামী শিক্ষার উপর আপত্তি করে থাকে, তারা খোদা তাআলার সত্তা এবং অস্তিত্বে অস্বীকারকারী, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে; খোদার সত্তার বিশ্বাসই মূলতঃ (ধর্ম) বিশ্বে সকল অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে।

আমি পূর্বেও একটি খুতবায় বলেছিলাম, ইংল্যান্ডেও একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে যেটিকে এ বছরের সেরা পুস্তকের মধ্যে গণ্য করা হচ্ছে আর একে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত পুস্তক আখ্যা দেয়া হচ্ছে। এতেও আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে অস্বীকারের অপচেষ্টা করা হয়েছে। একই ভাবে জার্মানীতেও ইসলাম এবং খোদা তাআলার সত্তা সম্পর্কে নিরর্থক ও বাজে কথা-বার্তা বলা হয়েছে। যখন পোপ এখানে এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় আঁ-হযরত (সাঃ) এবং খোদা সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। এরূপ কথা-বার্তা বলেছেন যে, হতবাক হতে হয় এমন পদমর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি শান্তি ও ভালবাসা বিস্তারের দাবী রাখেন তিনি কিভাবে এ ধরনের কথা বলতে পারেন?

কিন্তু যে স্বাধীনতার নামে তিনি কথা-বার্তা বলেছেন বা বিভিন্ন নেতার বিবৃতিতে যা দেখা যায় অথবা বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে একান্ত হীন ও মর্মপীড়াদায়ক যে কথা-বার্তা পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়, সেই স্বাধীনতা এতটাই লাগামহীন হয়ে গেছে যে, স্থানীয় বাসিন্দা যারা কিছু না কিছু ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে, সেই স্বাধীনতা তাদের খৃষ্ট-ধর্ম এবং হযরত ঈসা (আঃ) যিনি খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী খোদা; তাকেও নিজের করাল স্রোতে বয়ে নিয়ে গেছে। এখানে সম্প্রতি অপেরাতে একটি নোংরা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। যার বিরুদ্ধে খৃষ্টান বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কোন আপত্তি

করেনি বরং একে বৈধ বিবেচনা করেছে আর কেবলই বৈধই সাব্যস্ত করেনি বরং পছন্দও করেছে। এ অবিার এমন সীমায পৌঁছেছে যে, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দও একে বৈধ ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে তুর্কী নেতারা রয়েছে আর অন্যান্যরাও। যাই হোক ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন একটি খৃষ্টান শ্রেণী এবং অনেক পাদ্রীও আছেন যারা আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের সময় আহমদীদের প্রতিবাদকে যুক্তিযুক্ত আর তাদের কর্মকে ভুল ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং বাক স্বাধীনতার নামে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত আর খোদা ও নবীদের সম্মানের উপর আক্রমণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটিই সত্যকথা স্বাধীনতার নামে অন্যের আবেগ নিয়ে খেলে এবং বলে যদি এর বিরুদ্ধে আপত্তি করো তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে পাশ্চাত্যের ব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছ, আর যেই এ ধ্বণী উত্তোলন করবে সে আমাদের সমাজে বসবাস করার কোন অধিকার রাখে না। যেখানে তোমাদের দেশ সেখানে ফিরে যাও। নিজেদের ক্ষেত্রে এরা একান্ত স্পর্শকাতর। নিজেদের জন্য নীতি হলো আমরা যা ইচ্ছে তাই করবো, যেভাবে ইচ্ছে স্বাধীন জীবন-যাপন করবো। মর্জি মাফিক যাকে যা ইচ্ছে তাই বলবো। পোশাকের বেলায় যেভাবে মন চায় সেভাবে পরিধান করে বা করে না, বাজারে উলঙ্গ ঘুরাফিরা করতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমান মহিলা যদি সানন্দে নিজের মাথা ঢাকে, স্কার্ফ বাঁধে তাহলে তাদের আপত্তি দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের অশান্তিমূলক মন্তব্যের অবতারণা করে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও যুবকশ্রেণীর মাঝে ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে বিশ্ব (পাশ্চাত্য যে ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে) ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সরতে চায় কেননা এদের কাছে যে ধর্ম আছে তাতে প্রাণ নেই; প্রাণ সঞ্চারী নয়। তারাতো একজন মানুষকে খোদা বানিয়ে শির্‌ক এ নিপতিত হয়ে পরিশেষে সেই পর্যায়ে পৌঁছতই যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মুসলমান দাবীকারকরাও জাগতিকতার পূজায় অথবা দুনিয়াবাসীর ভয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, গোপন বা প্রকাশ্য শির্‌ক এ লিপ্ত হয়ে সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে যা ধর্ম এবং খোদা থেকে দুরে সরিয়ে নেয়ার গন্তব্য।

অতিতেও এ ধরণের মানুষ ছিল যারা নবীদের অস্বীকার করেছে, তাঁদের উপহাস করেছে, শির্‌ক আর নোংরামীতে নিমজ্জিত হয়েছে ফলশ্রুতিতে শাস্তিও এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করতেন অথবা করেন যেন তাঁদের মেনে বিভ্রান্ত মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসে এবং ইহকাল এবং পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু অস্বীকারকারীদের একটি বড় সংখ্যা সতর্ক করা আর বুঝানো সত্বেও আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এবং আযাবের শিকার হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে কতকের ইতিহাস আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন আর সেই পাপের উল্লেখ করেছেন যা সেই জাতির মাঝে প্রচলিত ছিল। আজ দেখুন! সেটি কোন্ পাপ যা অতিতের বিভিন্ন জাতিতে ছিল, খোদা তাআলা যার উল্লেখ করেছেন এবং বর্তমান কালের মানুষের মধ্যে নেই? আমি পূর্বেও বলেছি, নবীদের বুঝানো সত্ত্বেও কেবল কয়েকজন ব্যতীত তারা সে পাপ থেকে বিরত হয়নি। সেই জাতির লোকেরা নির্লজ্জতার চরমে পৌঁছেছিল, নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ধোঁকায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এরা ছোট খাট প্রতারণার আশ্রয় না নিলেও বৃহৎক্ষেত্রে প্রতারণা চলছে। স্বজাতির সাথে না করলেও বিজাতির সাথে প্রতারণা অব্যাহত আছে। এসব কিছু এখনও হচ্ছে। মিথ্যার বেলায় তারা চরম সীমায় পৌঁছে ছিল যা আজও আমাদের চোখে পড়ে। তারা শির্‌ক'এর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যা আজও আমরা দেখতে পাই। বস্তুত বিভিন্ন জাতিতে অনেক পাপ এমন ছিল যেক্ষেত্রে তারা সীমাতিক্রম করেছিল, আর নবীদের বুঝানো সত্তেও বিরত হয়নি। যাঁর সৃষ্টি, যিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষ ও জ্বিন্নকে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যকে যদি পূর্ণ না করো তাহলে তাঁর শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাবে। তাদের কর্মের এই যৌক্তিক ফলাফলই বের হতো; অতীতে তাই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে আর আমরা ঘটতে দেখছিও। নতুবা আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্বের জাতিসমুহের এ নিবেদনের অধিকার থাকবে যে, একই পাপের কারণে আমরা শাস্তি পেয়েছি কিন্তু আমাদের পরবর্তীরা স্বাচ্ছন্দেই আছে তাদের কোন শাস্তি হয়নি; যেহেতু আল্লাহ্ মালিক বা সর্বাধিপতি তাই অনেকেই পৃথিবীতে শাস্তি ভোগ করে আর কতেক মৃত্যুর পরে; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সুন্নত বা নিয়ম অনুযায়ী এ ধরণের মানুষ পরিশেষে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির আওতাধীন হয়। বর্তমানে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা অন্যায় করেন, একটি ভিত্তীহিন কথা, খোদা তাআলা অন্যায়কারী নন। মানুষ যে পরস্পরের সাথে অন্যায় করে তা খোদাতাআলা নবীদের মাধ্যমে শিখান না বরং এরা এমন ধরণের মানুষ যারা নিজেদের যুলুমের কারণে শাস্তি পেয়ে থাকে। মানূষ কর্তৃক প্রবর্তিত আইন সংখ্যা গরিষ্ঠের অসম্মতির কারণে রদও হয়ে থাকে, পরিবর্তনও করা যেতে পারে, কম-বেশীও করা যেতে পারে। তারা বলে, যে এর বিরোধিতা করবে সে শাস্তি পাবে; অবশ্য তারা বলে, আমরা একান্তই মানবদরদী! উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের দেশসমূহে যাবজ্জীবন শাস্তির বিধান রয়েছে, চরম শাস্তি যা তারা নির্ধারণ করেছে তাহলো যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কিন্তু আইন হচ্ছে কাউকে ফাঁসী দেয়া যাবে না কেননা, মানুষের প্রাণ হরণ মানবতা পরিপন্থী! অপরদিকে যে নিহত হয়েছে তার পরিবার সারা জীবন এর যতই ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করুক না কেন হত্যাকরিীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

যাই হোক আমি বলছিলাম যে, যদি তারা অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখে, কম হোক বা বেশি, যতটা পছন্দ ততটা

কিন্তু শাস্তি দিয়ে থাকে; তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, যিনি সর্বাধিপতি! তাঁর আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের অধিকার কেন থাকবে না? কিন্তু এরা যারা ধর্ম নিয়ে হাসি-তামাশা করে তাদের কাছে একথাকে অগ্রাহ্য করার জন্য কোন যুক্তি নেই যে, খোদা তাআলার এই অধিকার আছে কি নেই। সুতরাং তাদের কতক অজ্ঞতার কারণে আর অধিকাংশ জেনে-শুনে ধর্মকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। ধর্মের সেই বিকৃত চেহারা তুলে ধরে যা মানুষের নিজের বানানো, খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নির্দেশাবলী নয়। এই ভুল চিত্র উপস্থাপন করে বলে যে, এটিই নবীদের শিক্ষা, এশিক্ষাই নবীদের খোদা তাঁদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। অধিকন্তু বলে-প্রমাণিত হলো, নবীরাও বিশৃংখলা পরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন আর খোদাও, নাউযুবিল্লাহ্!

এখানকার যে অপেরার কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম তাতে এমন এক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে যাতে নবীদের অসম্মান করা হয়। কাহিনী হলো–একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের শিকার হয়। রাজা সমুদ্রের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে যে, যদি তারা নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে তাহলে সর্ব প্রথম যাকে দেখবে তার কুরবানী পেশ করবে। দৈবক্রমে সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি যার উপরে পড়ে সে ছিল তার পুত্র। তখন সে নিজে ইচ্ছা পরিবর্তন করে। শুনেছি তিন বছর পূর্বেও এই কাহিনী প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত কাহিনীতে ছিল যে, এতে খোদা অসন্তুষ্ট হন, দেবতা অসন্তুষ্ট হন আর জাতির উপর প্রচন্ড ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে। ফলে রাজা কুরবানী করে আর শাস্তি টলে যায়। যেহেতু ধর্ম নিয়েও হাসি-তামাশা করার ছিল আর বিশেষভাবে মুসলমানেরা টার্গেট ছিল তাই এখন কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রীক দেবতা এবং হযরত বুদ্ধ, এবং হযরত ঈসা এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিকৃত প্রতিচ্ছবি চিত্রায়িত করে চরম অন্যায় করেছে। যাই হোক এই নোংরামীর পর এখন কাহিনীর মোড় যেভাবে ঘুরানো হয়েছে তাহলো রাজা কুরবানী না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করেছেন কেননা মানুষের বিবেক খোদার স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের বিপরীত বিজয়ী হওয়া আবশ্যক ছিল। এখন তারা নবীদেরকে খোদা তাআলার সর্বব্যাপী অত্যাচারের (নাউযুবিল্লাহ্) প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করেছে। এই নাটক একবার এখানে প্রদর্শিত হয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যে পুনরায় দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'**।

এই বস্তুবাদীদের খোদা তাআলার শক্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণাই নেই। আল্লাহ্ তাআলা নিজের ও নবীদের জন্য পরম আত্মাভিমান রাখেন। এবং আল্লাহ্ তাআলাকে অসম্মান করার দোষেও দোষী, এই নবীকে অবমাননার অপরাধেও অপরাধী। যে মহানবী সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, **'যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে এই পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না'** যে খোদার প্রতিপালন আর অনুকম্পার বদৌলতে এরা জাগতিক দানে সমৃদ্ধ হচ্ছে তাঁর উপরেই অপবাদ আরোপ করছে। গাছের যে শাখায় বসে আছে সেটিই কাটছে। তাই কেউ এদেরকে বলুক যে, **হে বস্তুবাদীরা তোমরাই যালেম আর অকৃতজ্ঞ এবং বিবেকহীন**। আমি জানতে পেরেছি যে, এই বিষয়টিকে বেশি উড়াচ্ছে মন্ত্রী বড় বড় আমলারা, কেননা থিয়েটারের পরিচালিকা মহিলা সম্ভবত এবং নবীদের এই অংশ কেটে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সে সকল মন্ত্রী এবং আরো কেউ কেউ অবশ্যই দেখাও আমরা তোমাদের সাথে আছি। এদের সম্পর্কে জানা গেছে যে, এরা স্বয়ং চরম চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার। এই হলো এদের স্বরূপ। এমন অপকর্মে লিপ্ত যার কোন সীমা নেই। তাদের এরূপ বলাই স্বাভাবিক! এ ধরনের কদর্য কথা ছড়িয়ে দাও যাতে আমাদের স্বরূপ গোপন থাকে। তারা তো এমনিই ধর্মবিরোধী।

আরো একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, এতে হযরত মূসা (আঃ)কে কোথাও দেখানো হয়নি। আমরা মোটেই এই কথা বলছি না যে, তাঁকে দেখানো উচিৎ ছিল। আমাদের দৃষ্টিতে সকল নবীই সম্মানিয় আর খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত। কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের দূরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে যায়? পত্র-পত্রিকাসহ অনেকের ধারণা, এর ফলে ইহুদীরা মনঃক্ষুন্ন হতে পারে। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়, আমার মতে বিষয়টি আরো গভীর। এটি ইসলামের বিরুদ্ধেও একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম এবং আহমদীয়াতকে শত্রুদের সকল দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন।

আজ শত্রুদের এরূপ অপকর্মের জবাব দেয়া আর বিশ্বকে খোদার শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। সুতরাং এদেরকে বলুন, প্রত্যেকেই নিজের পরিচিতজনকে বলুন। এই নামধারী মুসলমানদেরকেও বলুন যে, এই অপকর্মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মুক্তির পরিবর্তে আগুনের গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। খৃষ্টান বিধর্মী ও অন্যান্যধর্মে বিশ্বাসীদের বলুন, নবীদের আগমন বিশ্বের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। মানুষকে অন্যায় থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে প্রেরণ করেন, অন্যায় করার উদ্দেশ্যে নয়। আস আমরা তোমাদেরকে অবহিত করি; এই খোদা যিনি ইসলামের খোদা তিনি তাঁর 'রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্যের' বিকাশ ঘটিয়ে, এরূপ স্বেচ্ছাচারিতামূলক কর্মকান্ড সত্বেও তোমাদেরকে বিভিন্ন দানে ভূষিত করেছেন, তাঁর দিকে আস আর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তাআলা কখনও যুলুম করতে পারেন এ ধারণা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে বের করে দাও। তিনি তোমাদের প্রতি সহানুভূতির কারণে নবীদেরকে প্রেরণ করেন যেন তোমাদেরকে নোংরামি থেকে পবিত্র করেন। যেভাবে তিনি স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়েছেন, **'লায়াল্লাকা বাখিউ নাফসাকা আল্লা ইয়াকূনূ মু'মিনীন** (সূরা আশ্ শো'আরা: ৪) অর্থাৎ, 'সম্ভবত: তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করে ফেলবে যে, কেন তারা মু'মেন হচ্ছে না।' নবীদের যদি কোন অভিলাষ থেকে থাকে তাহলে তা

হচ্ছে কেবল বান্দারা যেন খোদার নির্দেশাবলীর অনুসরণ করে, যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে খোদা তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে আর কেবল জাগতিক নেয়ামতরাজিই নয় বরং আধ্যাত্মিক পুরস্কারাদিও অর্জনকারী হয়। তাঁরা নিজেদের রাতের নিদ্রা মানুষের দুঃখে বিসর্জন দেন যেন মানুষ ঈমান আনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং এই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা যাতে তোমাদের জন্য মুক্তি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত। তাই যদি কোন সমুদ্র বা পানি অথবা বাতাস 'খোদার' ধারণা থাকে তাহলে তোমাদের মানব প্রসূত ধারণা। ইসলামের খোদা এক খোদা। সকল শক্তির অধিকারী খোদা। যিনি অদৃশ্য আর দৃশ্যমান সব কিছুর জ্ঞান রাখেন। সেই খোদা যিনি ইসলামের খোদা তাঁর পবিত্রতম শিক্ষা যা কুরআন করীমে অবতীর্ণ করেছেন; সে অনুযায়ী আমাদের বলা হয়েছে, **যখন এরূপ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন মানুষ সামুদ্রিক ঝড়ে আটকা পড়ে তখন আমাকে স্মরণ কর আর অঙ্গীকার কর যে, যদি আমরা প্রাণে রক্ষা পাই তাহলে অবশ্যই তোমার ইবাদত করব, তুমি আমাদেরকে বাঁচাও। কিন্তু যখন স্থলে পৌঁছে তখন আবারো খোদাকে ভুলে যায়।** আল্লাহ্ তাআলা নিজ বান্দাদের প্রতি দয়া করেন। এবং দয়ার কারণেই স্বীয় নবীদের প্রেরণ করেন যেন নিজ বান্দাদেরকে শয়তানের থাবা থেকে রক্ষা করতে পারেন, আর তাঁরা ঘোষণা করেন, আমরা তোমাদের কাছ থেকে এই সেবার কোন প্রতিদান চাই না, আমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ঘোষণা করে রেখেছেন যে **'ইন আজরিয়া ইল্লা আলাল্লাযী কাত্বারনী আফালা তাক্বীলুন' (সূরাতুল হুদ: ২৫)** অর্থাৎ আমার পারিশ্রমিক সেই সত্তার কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না। প্রত্যেক আহমদীর জন্য জার্মান জাতির প্রত্যেকের কাছে এই পয়গাম পৌঁছানো আবশ্যক, **'হে বিপথগামী মানুষ! হে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত মানব! আল্লাহ্ তাআলা তোমার প্রতি দয়ারপরবশ হয়ে এ যুগেও তাঁর শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বে একজন নবী আবির্ভূত করেছেন।'**

সতুরাং ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি খুঁজে বেড়ানো আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ এবং নাউযুবিল্লাহ্ এই পরম দয়ালু খোদাকে অত্যাচারী সাব্যস্ত করার পরিবর্তে, এই খোদার আশ্রয়ে আস যিনি পিতা-মাতার চেয়েও বেশি নিজ বান্দাদের প্রতি মমতাশীল। তিনি নিজ বান্দাদেরকে আগুন থেকে রক্ষার জন দৌড়ে আসেন শর্ত হচ্ছে যে, বান্দাও যেন তাঁর দিকে কমপক্ষে দ্রুত হেটে আসার চেষ্টা করে। শুন! এ যুগের ইমাম আর আল্লাহ্ তাআলার এই নবী কত স্নেহ এবং ভালবাসার সাথে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেন, **“যে কাজের জন্য খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, আমি যেন খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছে–একে দূরীভূত করে ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করি আর সত্যের প্রকাশ দ্বারা ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তির ভিত্ রচনা করি। সেসব ধর্মীয় সত্য যা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে যেন পুনঃপ্রকাশ এবং কুপ্রবৃত্তির নীচে চাপা পড়া আধ্যাত্মিকতাকে আমি যেন জগতে উপস্থাপন করি।”** (লেকচার লাহোর-রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড-১৮০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে জ্ঞান, খোদার মারেফত এবং দলিল প্রমাণের অমূল্য সম্পদ প্রদান করে এ কাজের লক্ষ্যে দন্ডায়মান করেছেন। প্রত্যেক আহমদী যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে বয়াতের সত্যিকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ তার জন্য স্বীয় বয়াতের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার পাশাপাশি 'নিজের জন্য যে জিনিষ পছন্দ কর নিজ ভাইয়ের জন্যও পছন্দ কর' এই সহানুভূতির প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে; সেই পয়গামকে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন তা এ জাতির প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো কর্তব্য। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন আজ আমরা কার্যতঃ তাই দেখতে পাচ্ছি; সেই পঙ্কিলতার কারণে আর সেই কুধারণা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে যা নামধারী ধর্মীয় নেতারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে খোদা ও বান্দার মাঝে সৃষ্টি করে রেখেছে, বান্দা আর খোদার মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, সোচ্চার হওয়া এবং খোদা তাআলা ও ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে মানুষকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা। অধিকাংশের হৃদয়ে খোদা তাআলা এবং খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) আর খোদা তাআলার পবিত্র বান্দাদের জন্য ভালবাসা ও আন্তরিকতার প্রেরণা সৃষ্টি করুন, যেন পুরো মানবতা যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হয়, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে আর যদি এরূপ হয় তাহলে খোদাকে দোষারোপকারীরা তাঁর সমীপে সমর্পিত হবে, **ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এ জাতিতে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করবে আর আজ আমরা দেখছি যে, অনেক জার্মান আহমদী স্বজাতির এরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণে লজ্জিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জার্মান আহমদী খোদা এবং নবীদের সম্পর্কে এদের এরূপ ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে লজ্জিত হবে।**

জার্মান একটি কর্মঠ জাতি। যদি আজকের আহমদীরা নিজেদের তবলিগী দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেন তাহলে এ জাতি একটি মহান বিপ্লব সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একবার বলেছিলেন, জার্মান জাতির চরিত্র উন্নত এবং তারা এত দ্রুত হামবুর্গ শহর নির্মাণ করেছে যে, আশ্চর্য হতে হয়। আরো বলেন, জার্মান জাতি এই দৃঢ় প্রেরণার কারণে অবশ্যই সত্বর ইসলাম গ্রহণ করবে

যা স্বয়ং এই প্রেরণাকে সমন্নুত করার শিক্ষা প্রদান করে। সুতরাং আমাদের কাজ সংবাদ পৌঁছানো, যেক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

এখানে আপনাদের কাছে যে সকল লিটারেচার আছে সে ব্যাপারেও আমার ধারণা একই সময়ে ছেপেছে আর মনে হয় একটি অভিযানের আকারে কয়েক হাজার বিতরণ করা হয়েছে, পুনরায় ছাপানোর পরিবর্তে সেখানেই থেমে গেছে; অথবা ষ্টকে রাখা আছে আর যথেষ্ট সংখ্যায় পড়ে আছে। বিতরণ না করাও ঠিক নয়। বর্তমানে সময়োপযোগী বই পুস্তকের প্রয়োজন আর এই যে প্রশ্ন উঠছে তা আজকে নতুন নয় সর্বদাই উঠানো হচ্ছে; উত্তর প্রস্তুত আছে কেবল পৌঁছানো প্রয়োজন। প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই লিটারেচার থাকা উচিৎ। প্রত্যেক আহমদী পুরুষ, মহিলা, বৃদ্ধ এবং যুবককে সমসাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী বই এবং সাধারণ তবলীগি লিটারেচার প্রত্যেক 'জার্মানবাসী'র কাছে পৌঁছানো উচিত অথবা পৌঁছানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আজকাল এ কাজের জন্য ইন্টারনেট এবং ই-মেইল প্রভৃতির ব্যবহার হচ্ছে। এ ব্যাপারেও পরিকল্পনা করুন যে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিভাবে এথেকে বেশি বেশি লাভবান হওয়া যায়। এর অপব্যবহার হচ্ছে; প্রশ্ন হলো এর সঠিক ব্যবহার কেন করা যাবে না? সময় সুযোগ অনুযায়ী সকল সাংসদ, মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, প্রত্যেকটি সংবাদ পত্র, বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক নেতা এবং শিক্ষিত সমাজের কাছে আহমদীয়াত এবং ইসলামের সত্যিকার পরিচিতি তুলে ধরুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর যুগে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে যতদূর পৌঁছানো সম্ভব আমি ভারতের সেই স্থান পর্যন্ত একে পৌঁছাবো।" এরপরে তিনি আমাদেরকে সম্বোধন পূর্বক বলেছেন,

"কুরআন প্রচারের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও। আর শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে বেড়াও।"

এরপর বলেন, **ইংরেজ রাজত্বে (এতে সকল ইউরোপিয়ান দেশ অন্তর্ভুক্ত) এমন হৃদয় আছে যারা তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষমান আর খোদা তাআলা তোমাদের ও তাদের দুঃখের মাঝে প্রশান্তি রেখেছেন। তুমি সেই ব্যক্তির ন্যায় নির্বিকার হয়ো না যে দেখে চোখ বন্ধ করে নেয় আর ডাকলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তোমরা কি ঐ সকল দেশে ভাইদের কান্না শুনতে পাও না এবং সে সকল বন্ধুদের আওয়াজ তোমরা পাচ্ছ না? তোমরা কি রুগ্ন ব্যক্তির তুল্য হয়ে গেছ আর তোমাদের আলস্য অভ্যন্তরিণ ব্যধির পরিচায়ক নয়তো এবং ইসলামী মুল্যবোধ তোমরা কি বিস্মৃত হয়েছ এবং মহানবী (সাঃ)-এর কোমলতা তোমরা ভুলে গেছ? ....তোমরা মুমেনের বৈশিষ্ট্যাবলী ভুলে গেছ। হে লোক সকল! বন্দীদের মুক্তির জন্য আর পথভ্রষ্টদের হেদায়াতের লক্ষ্যে দন্ডায়মান হও.........নিজ যুগের অস্ত্র এবং যুদ্ধকে সনাক্ত কর।"**

তিনি আরো বলেন, "আমাদের যুগ দলীল-প্রমাণের অস্ত্রের মুখাপেক্ষী........। যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সত্য স্পষ্ট করা আর সন্দেহ নিরসন ব্যতীত তোমাদের বিজয় লাভ আদৌ সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে হৃদয়ে ইসলামের সত্যতা অন্বেষণের জন্য একটি গতি সৃষ্টি হয়েছে"। (নূরুল হক দ্বিতীয় খন্ড, রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড, ২৫২-২৫৪ পৃষ্ঠা)

তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথাকে সর্বদা স্মরণ রাখুন। নব দীক্ষিত আহমদীদেরকেও বলছি, আল্লাহ্ আপনাকে আহমদীয়াতে দীক্ষিত হবার সুযোগ দিয়েছেন তাই পূর্বের তুলনায় আরো বেশি সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছান যেন তারা এক খোদাকে চিনে নিজেদের ইহ ও পরকালকে সাজাতে পারে।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, **"ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী যদি আমাদের জামাতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে তারা অপারগ আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে তাদের সম্মুখে নিজ সত্যতার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন না করা হবে ততক্ষণ তাদের অস্বীকারের অধিকার রয়েছে। (মলফুযাত, নব সংস্করণ, ৫ম খন্ড, ১৫০-১৫১পৃষ্ঠা)**

অতএব আমি যেভাবে পুর্বেও বলেছি, বই-পুস্তকসহ প্রচারের সকল মাধ্যম অবলম্বন করা আবশ্যক। কয়েক হাজার বই পুস্তক ছাপিয়ে এ-ভেবে বসে থাকা যে, তা কোটি কোটি লোকের জন্য যথেষ্টহবে, এটি আহম্মকের স্বর্গে বাস বৈ আর কিছু নয়। আমাদের সামর্থ সীমাবদ্ধ একথা ঠিক কিন্তু যেটুকু আছে তারওতো সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। একদিকে মনযোগ নিবদ্ধ হয় তো অন্যদিকে ভুলে যায়। তাই কেবল কেন্দ্রীয়ভাবেই নয় বরং প্রত্যেক অঞ্চলে, প্রতিটি শহরে, প্রত্যেক এলাকা সেখানে আহমদী বসবাস করুক বা না করুক একটি ছোট্ট পরিচিতিমূলক লিফলেট পৌঁছা উচিত তারপর যেভাবে আমি বলেছি, অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমকেও কাজে লাগান।

পোপের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তারা ছোট্ট একটি উত্তর প্রস্তুত করেছিল। আমি একটি বিস্তারিত পুস্তিকা প্রকাশ করতে বললে এখন জার্মানী জামাত তা প্রস্তুত করছে। আমরা তাদেরকে কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্থান থেকে তথ্য সরবরাহ করেছি। কেন্দ্রীয়ভাবেও এটি প্রস্তুত হচ্ছে আর এখন পর্যন্ত হয়ে যাবার কথা। যাই হোক; আমার মনে হয় শেষ পর্যায়ে আছে। আল্লাহ্ করুন যেন দ্রুত ছাপা হয়ে যায় তারপর পোপকেও এবং এখানকার শিক্ষিত মহলের হাতে পৌঁছে যাওয়া উচিত। যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে খোদার স্বরূপ কি, আর মহানবী (সাঃ)-এর পদমর্যাদা কেমন এবং তাঁর আদর্শ কত অনুপম। সেই সত্তা যাঁকে এরা অত্যাচার, সন্ত্রাস আর বলপ্রয়োগের প্রতীক মনে করে তিনিতো আপাদমস্তক দয়া এবং 'রহমাতুল্লিল আলামীন' উপাধি প্রাপ্ত। যিনি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আর বিনয় এর মহান অগ্রদূত ছিলেন। বিদ্বেষমুক্ত অমুসলিমরাও তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাই

স্মরণ রাখুন! লিটারেচার এবং তবলীগি সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ্ করা যেখানে দেশীয় কেন্দ্রের কাজ সেখানে কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গৃহে পৌঁছানোই নয় বরং প্রত্যেকের হাতে পৌঁছানো, সকল ছোট-বড় বৃদ্ধ ও যুবকের কাজ। আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিরন্তর একাজে লেগে থাকা আর এটিই আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ। ফলাফল সৃষ্টি করার কাজ খোদা তাআলার কিন্তু এজন্য আল্লাহ্ তাআলা যে রীতি-নীতি-পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। নতুবা নিজদের ভুল-ভ্রান্তি আর অলসতা খোদার প্রতি চাপানোর নামান্তর হবে।

তবলীগ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার বাণী পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা যে রীতি বর্ণনা করেছেন তাহলো সৎকর্মশীল ও আনুগত্যশীল হওয়া। **নেযামে জামাতের সম্মানকারী আর আনুগত্যে অভ্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে ‘দাওয়াত ইলাল্লাহ্’ করতে পারবে আর তুমি যে পয়গাম পৌঁছাবে তা প্রভাবও সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যও লাভ হবে।** আল্লাহ্ তাআলা এরূপ লোকদের কথা পছন্দ করেন যারা এই গুণের অধিকারী। তিনি বলেন, যে **“ওয়া মান আহ্সানু ক্বাওলাম মিম্মান দা’য়া ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহান ওয়া ক্বলা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন”** (সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, ৩৪) অর্থাৎ, ‘এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত’।

সুতরাং আপনারা যা প্রচার করছেন সেই শিক্ষানুযায়ী সর্বপ্রথম নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করলে ফলাফল অবশ্যই বের হবে, কেননা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান এবং কোন তবলীগ আর প্রচেষ্টা ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রদ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ দয়া না করবেন। আল্লাহ্ তাআলার দয়া লাভের জন্য আন্তরিকতার সাথে তাঁর সমীপে সমর্পিত হওয়া এবং সেই সকল অধিকার যা আল্লাহ্ তাআলার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তা প্রদান আবশ্যক। সে সকল কথা এবং নির্দেশাবলীর উপর আমল করা আবশ্যক যা আল্লাহ্ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন। খোদা তাআলার সাথে সকল বিষয়ে স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন। বান্দাদের প্রাপ্য প্রদান আবশ্যক। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করা আর প্রতিবেশীর প্রাপ্য প্রদান করাও আবশ্যক। সমাজের অধিকার প্রদানও আবশ্যক। কোন আহ্মদীর অবস্থান যাই হোক না কেন স্থান-কাল ভেদে তার আশেপাশে যেই তার কাছে সাহায্য কামনা করে তাকে সাহায্য করা আবশ্যক।

যদি তবলীগকারী এবং মুবাল্লেগ এর কর্ম এরূপ হয় যে,তার পিতা-মাতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তার ভয়ে ভীত, মহিলার ফ্যাশনের অপ্রোয়জনীয় চাহিদায় স্বামী বিরক্ত, প্রতিবেশীরা তাদের আচরণ থেকে মুক্তি পেতে চায়, সামান্য বিষয়ে যদি রাগ ধরে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহলে এটি সৎকর্ম নয় । এরূপ লোকদের কোন প্রভাব পড়ে না। অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে । উন্নত গুণাবলী প্রদর্শন করলেই আল্লাহ্ তালা বরকত প্রদান করবেন ইনশাআল্লাহ্, কেননা আপনারাই আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী মান্যকারী আর পূণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী । যদি এমন হয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলার দয়া আকর্ষণকারী হবেন।

স্মরণ রাখুন! আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ‘আমি তোমাকে বিজয় দান করবো’ এ বিজয় ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আর আমেরিকাতেও হবে, আর দ্বীপবাসীগণও এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে না, ইনশাআল্লাহ্। তাই আপনাদের কাজ হচ্ছে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র হয়ে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন আর সৎকর্ম সম্পাদন করতঃ তাঁর বাণী পৌঁছাতে থাকা যেন সেই বরকত বা আশিস থেকে কল্যাণ মন্ডিত হতে পারেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য খোদা তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের বেশী প্রচারের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “আমি আশা করি, আর কিছু কাল পরে খোদার অনুগ্রহ তাদের অনেককে তাঁর তকদীরের বিশেষ হস্ত দ্বারা টেনে সত্য ও পূর্ণ তওহীদের সেই শান্তি নিকেতনে প্রবিষ্ট করবে যেখানে পরম ভালবাসা, পূর্ণ ভীতি ও পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান মান্য করা হয়। আমার এই প্রত্যাশা কাল্পনিক নয় বরং খোদার পবিত্র ঐশীবাণীর মাধ্যমে এই সুসংবাদ আমি লাভ করেছি। (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এ কাজ অবশ্যই হবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। **আল্লাহ্ তাআলা সকল সদাত্মাকে ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় দেবেন। এই বিরোধিতা এবং ধর্মের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা আমাদের দায়িত্বের প্রতি মনযোগ আকর্ষণের জন্য সৃষ্টি হয়। শেষ সিদ্ধান্ততো খোদার তকদীর করে রেখেছে, কিন্তু তোমাদের মাঝে যে আলস্য সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম বক্তা সাব্যস্ত হয়ে ইসলামের প্রকৃত মুক্তির বাণী স্বদেশের ছোট-বড় প্রত্যেকের কাছে পৌঁছান, আজ এটিই সবচেয়ে বড় মানব সেবা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।**

(হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুঁমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

“রহ্‌মানিয়্যাতের কল্যাণ সকল প্রাণীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এই কল্যাণ সর্বজনীন যা সবাই লাভ করছে আর এতে মানুষ অথবা প্রাণীকুলের শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই।”

“আল্লাহ্ তাআলার রহ্‌মান বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা”

সৈয়দনা আমীরুল মুঁমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৬ (১৫ই ফাতাহ্ ১৩৮৫ হিজরী শামসি এর জুমআর খুতবা।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফাউযু বিলাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর্ রহ্‌মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন ইহদিনাস্‌সিরা তাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

“হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আলীমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রাহীম” (সূরা আল হাশর : ২৩) ‘তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।’

গত খুতবায় আমি ‘রহমান বৈশিষ্ট্য’ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা থেকেই এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আরম্ভ হয়ে যায়, বরং এর সূচনাতেই আল্লাহ্ তাআলার প্রথম বৈশিষ্ট্য যা বর্ণিত হয়েছে তা ‘রাব্ব’ বা প্রভু। পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে এই ‘রাব্ব’ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছিলাম। যাই হোক, আজ যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমি করতে যাচ্ছি তা আল্লাহ্ তাআলার ‘রহমান বৈশিষ্ট্য’। পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতেহায় রাব্ব বৈশিষ্ট্যের পরে তার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেন, **“সূরা ফাতেহার ‘রব্বুল আলামীন’ বৈশিষ্ট্যের পরে খোদার নাম ‘রহ্‌মান’** বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে **‘আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আর্ রহমান”**

পুনরায় তিনি বলেন, “রহমানিয়্যাতের কল্যাণ এমনভাবে সব প্রাণীকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, পক্ষীকুলও এ কল্যাণের বিশাল সমুদ্রে আনন্দ ও কলকাকলিতে মুখর। যেহেতু ‘রব্ব’ এর পর এই কল্যাণ ধারার স্থান তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্ তাআলা সূরা ফাতেহার ‘রব্বুল আলামীন’ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের পরে তাঁর ‘রহমান’ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যেন প্রকৃতিগত বিন্যাশ বজায় থাকে।”

‘সিফাতে রাহমানিয়্যাত’ কী আর কিভাবে প্রাণীজগৎ এথেকে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে, তা বুঝানোর জন্য এর আভিধানিক অর্থ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবো যার বেশীরভাগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর ভাষায় আর দু-একটি পুরোন তফসীর থেকে থাকবে।

মুফরাদাত ইমাম রাগেব-এ লিখিত আছে, রহমত এমন কোমলতাকে বলে যার মধ্যে অনুগ্রহের অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উপর কোমলতা প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অনুকম্পা প্রকাশ করা হয় বা যে অনুগ্রহের প্রত্যাশা থাকে তা-ই রহমত। রহমত শব্দ কখনও কখনও কেবল কোমলতার জন্য ব্যবহৃত হয়, কেবল অনুগ্রহ নয় বরং কোমলতাও, আর কোন কোন সময় এমন অনুগ্রহের অর্থে ব্যবহৃত হয় যার সাথে কোমলতার মিশ্রণ নেই। অনুগ্রহ হবে কিন্তু কোমলতা নয়। তিনি এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেমন আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে বলা হয় ‘রাহেমাল্লাহু ফুলানান’ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা অমুকের উপর অনুগ্রহ করেছেন। আর রহমত শব্দ যখন আল্লাহ্ তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন কেবল অনুগ্রহের অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং কোমলতা ও কঠোরতার আবেগকে তিনি মানুষের সাথে বিশেষিত করেছেন।

তারপরে বলেছেন, যদি মানুষের জন্য ব্যবহার হয় তাহলে এর অর্থ নরম ব্যবহার করা আর দয়ার প্রেরণা নিয়ে করা। তিনি আরও বলেন, এই অর্থেই হাদীসে কুদসীতে এসেছে; ‘যখন আল্লাহ্ তাআলা মাতৃ জরায়ূকে সৃষ্টি করেছেন তখন বলেছেন, আমি ‘রহমান’ আর তুমি ‘রেহেম’ (মাতৃজঠর) আমি আমার নাম থেকেই তোমার নাম উৎসারিত করেছি। সুতরাং যে তোমার সাথে বন্ধনকে অটুট রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক গড়বো আর যে তোমাকে

ছিন্ন করবে আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। এই হচ্ছে মাতৃগর্ভের সাথে গর্ভজাতের সম্পর্ক নিকটাত্মীয়তার সাথে খোদা তাআলার 'রহমানিয়্যাত' বৈশিষ্ট্যকে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যে হাদীস পাঠ করা হয়েছে তাতে এ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গীত রয়েছে যে, 'রহমত' দু'টি অর্থে বিভক্ত একটি হচ্ছে 'আরবিক্কাহ্' অর্থাৎ কোমলতা, দ্বিতীয় 'হলো আল্ ইহ্সান, বা অনুগ্রহ করা। এটিও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা 'রহমানু দ্ দুন্ইয়া' এবং 'রহীমু ল আখিরাহ্', এর কারণ হল, এ জগতে তাঁর অনুগ্রহরাজি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবার জন্য সমান কিন্তু পরকালে কেবল বিশ্বাসীদের জন্যই নির্ধারিত। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে; **“ওয়া রহমাতী ওয়াসিয়্যাত কুল্লা শাইঈন ফাসাআক্তুবু হা লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুন'** (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭) অর্থাৎ আমার রহমত প্রত্যক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এবং অচিরেই আমি তা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

'আকরাবু লমওয়ারেদ'এ লিখিত আছে, 'রাহেমা'র অর্থ হচ্ছে, তার জন্য হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। তাকে ক্ষমা করেছে আর দয়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সাথে ব্যবহার করেছে। 'এসতারহামা'-তার কাছে দয়া ও স্নেহের প্রত্যাশা করেছে। আমি যা পূর্বে বলেছিলাম তিনিও সেকথাই লিখেছেন যে, 'রেহেম' মায়ের স্নেহে ভ্রুনের লালিত-পালিত হওয়ার স্থান, তারপর ঘনিষ্ট ও নিকটাত্মীয়ও এর অর্থ। 'আর্ রহমান' সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার সুন্দরতম নামগুলোর একটি, আর কেবল আল্লাহ্ তাআলার জন্যই প্রযোজ্য অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না, আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'আর রহমাহ্' হৃদয়ের কোমলতা, ও স্নেহের প্রেরণা নিয়ে অন্যের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রবণতা ছাড়া এ-শব্দ মার্জনার অর্থও বহন করে।

'লিসানুল আরব'এ লেখা আছে যে, 'আর্ রহ্মা'র অর্থ হলো হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার প্রেরণা সমৃদ্ধ ব্যবহার এবং ক্ষমা। তিনি রহমান এবং রহীম দু'টো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন কেননা উভয় শব্দের মূলধাতু একই। লিখেছেন যে, এর মধ্যে থেকে রহমান মুবালেগার সীগা, এর অর্থে আধিক্য বা অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ তাঁর রহমত প্রত্যেক বস্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আবার বলেন, 'রহমান' বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লাহ্ তাআলার জন্য প্রযোজ্য। তারপর বলেন, যদি 'রহমান' শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ হবে, মনের কোমলতা আর দয়ার্দ্রতার সাথে ব্যবহার করা। 'রহমত' শব্দ যদি আল্লাহ্ তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ হবে আল্লাহ্ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ এবং কোমলতা।

আরেকটি অর্থ উল্লেখ করেন, 'আল্গাইছ' প্রয়োজনের সময় বর্ষিত কল্যাণকর বৃষ্টিকেও আল্লাহ্ তাআলা রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন কেননা, এটি আল্লাহ্ তাআলার দয়ায়ই বর্ষিত হয়। সুতরাং এসবকিছুর অর্থ যা সামনে আসে বা এর যে সংজ্ঞা দাঁড়ালো তাহলো 'রহমান' খোদার অর্থ হচ্ছে, পুরস্কার প্রদানকারী করুণা ও অনুগ্রহকারী, দয়ার সাথে সৃষ্টি প্রদানকারী আর রিয্কদাতা। এই যে অনুগ্রহ, পুরস্কার, করুণা আর দয়া ও রিয্ক প্রদান তা সব কিছুর উপর ছেয়ে আছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেছেন, **“রহমানিয়্যাতের কল্যাণ সকল প্রাণীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।”**

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী লিখেছেন, 'আর রহ্মান' এরূপ পুরস্কার দাতা সত্তাকে বলা হয় বান্দাদের মধ্যে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

'রহমানিয়্যাত' এর প্রকাশ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করছি:- **ইব্রাহীম বিন আদহ্ম সম্পর্কে উল্লেখ আছে; তিনি বলেন, আমি কারো বাড়ীতে অতিথি ছিলাম তারা আমার সম্মুখে খাবার পরিবেশন করেন। খাবার খাচ্ছিলাম সে সময় একটি কাক এসে আমার সম্মুখ থেকে একটি রুটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। বলেন যে, আমি একান্ত আশ্চর্য হয়ে কাকের পিছু পিছু চলতে লাগলাম দেখি সে কি করে, কোথায় নিয়ে যায়? দেখলাম কাক একটি টিলার উপর অবতরণ করলো যেখানে একজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় ছিল। কোন মানুষকে একটি উঁচু স্থানে পাহাড়ের টিলায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। তার দু'টি হাতই বাঁধা ছিল। আমি দেখলাম যে, কাক সেই লোকটির সম্মুখে রুটি রেখে দিল” (আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজি'র তফসীরে কবীর–সুরাতুল ফাতিহার তৃতীয় পরিচ্ছেদ এর আর্ রহমান আর্ রাহীম এর তফসীর)**

রহমানিয়্যাতের এটি একটি ঘটনা যা তিনি তাঁর তফসীরে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, **“আমি নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ছিলাম তখন দেখতে পেলাম যে, একটি বড় বিচ্ছু এল আর নদীতে বেশ বড় একটি ব্যাঙ ছিল। বিচ্ছুটি ব্যাঙ এর উপর চড়ে বসলো। তিনি বলেন যে, আমিও নৌকায় চড়ে এর সাথে সাথে যেতে থাকি, দেখি এরা কোথায় যায়। আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো, অপর প্রান্তে পৌঁছে বিচ্ছুটি একদিকে যেতে থাকে আর আমিও পিছু পিছু যেতে থাকি। দেখলাম গাছের নীচে একজন মানুষ শুয়ে আছে আর একটি সাঁপ তাকে দংশন করতে উদ্যত। বিচ্ছুটি গিয়ে সাঁপকে হুল ফুটোয় আর সাঁপ বিচ্ছুকে কামড় দেয়, উভয়েই মরে যায় আর মানুষটি প্রাণে বেঁচে যায়।** আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে অনেক সময় স্বীয় 'রহমনিয়্যাত' এর বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন তা তিনি একটি গল্পের আকারে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'রব্ব' এর পরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'রহমান' যার এমন অনেক অর্থ আছে যা 'রব্ব' এর মাঝেও পাওয়া যায়। 'রব্ব' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সকল বস্তুর স্রষ্টা আর প্রতিপালনকারী; সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমালা এতে অন্তর্ভুক্ত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'রহমান' এর অর্থ করেছেন, “কোন কর্ম ছাড়াই তিনি পুরস্কার প্রদান করেছেন।” মহানবী (সা:)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ:)-এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, “সূরা

ফাতিহায় আল্লাহ্ তাআলার যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যে চারটি ‘গুণ’ এর উল্লেখ হয়েছে, আঁ হযরত (সাঃ) এই চারটি বৈশিষ্ট্যের বিকাশস্থল ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বৈশিষ্ট্য ‘রাব্বুল আলামীন’ আঁ হযরত (সাঃ)-ও এর বিকাশস্থল ছিলেন। দেখুন স্বয়ং খোদা তাআলা বলেছেন, ‘ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতুল্লিল আলমীন’ (সুরাতুল আম্বিয়া: ১০৮) যেভাবে ‘রাব্বুল আলামীন’ সর্বময় প্রতিপালন প্রত্যাশা করে অনুরূপভাবে মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণ আশিসমূহ এবং তাঁর হেদায়াত ও প্রচার পুরো পৃথিবী আর সমগ্র বিশ্বের জন্য ছিল।

এরপরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘রহমান’। মহানবী (সাঃ) এই বৈশিষ্ট্যেরও পূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন, কেননা তাঁর কল্যাণ ও আশিসের কোন বিনিময় বা প্রতিদান নেই। এখানে আরেকটি কথা সামনে এসেছে, পূর্বে কোন অভিধানে কোন তফসীরকারক বর্ণনা করেছেন যে, ‘রহমান’ কেবল খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, ‘রহমান’ বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে আর পূর্ণ মানব আঁ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিল। বরং তিনি (আঃ) এ পর্যন্ত বলেছেন যে, একজন সাধারণ মানুষও এর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে আর হওয়া উচিত। এজন্য তিনি (আঃ) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন “যে কাজ তুমি কোন প্রতিদান ছাড়া করো, মানব কল্যাণের প্রেরণায় সৃষ্টির সেবা কর তা এই বৈশিষ্ট্যেরই অনুবর্তিতায় কর, আর করা উচিত। অধিকন্তু একস্থানে তিনি (আঃ) বলেছেন, “যারা আমার বয়াত করেছে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য অবলম্বন না করে তাহলে তারা নিজ বয়াত ও অঙ্গীকারে মিথ্যাবাদী।” সুতরাং এদিকেও প্রত্যেক আহমদীকে অনেক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে যেহেতু সৃষ্টির সেবামূলক কাজের কথা এসে গেছে তাই বলছি, জামাতে দরিদ্রদের বিবাহ্-শাদী, চিকিৎসা ও শিক্ষা বিষয়ক একটি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ছেলে-মেয়ের বিবাহ-শাদীর জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) ‘মরিয়ম শাদী ফান্ড’ প্রবর্তন করেছিলেন। এটি খুবই ভালো এবং অনেক মহৎ সৃষ্টি সেবা, জামাতের সদস্যদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এরপরে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান; বিশেষভাবে দরিদ্র দেশসমূহে, পাকিস্তানে ও আফ্রিকার দেশসমূহে এবং অন্যান্য গরীব দেশেও এদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এই ফান্ডে সৃষ্টি সেবার প্রেরণা নিয়ে অর্থ দিন, চাঁদা ও সদকাহ্ দিন তাহলে আল্লাহ্ তাআলার গুণ অবলম্বনের কারণে তাঁর রহমানিয়্যাত থেকেও বেশী বেশী কল্যাণ লাভ করবেন। এভাবে শিক্ষা খাতে, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার পিছনে অনেক ব্যয় হয়ে থাকে, যথেষ্ট ব্যয় বহুল। তাই যাদের সামর্থ আছে তাদেরকে দেয়া উচিত। কথা যেহেতু উঠেছে তাই আমি উল্লেখ করেছি, পাকিস্তানে রাবওয়াতে এবং আফ্রিকায় জামাতী হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। তারা যদিও বেতন পান আর আয় থেকেও একটি অংশ পেয়ে থাকেন, কিন্তু তা অন্যদের তুলনায় কম হতে পারে। তিন বছরের জন্যই হোক বা পাঁচ বছরের জন্যই অথবা সারা জীবনের জন্যই করুন, মোটকথা সৃষ্টি-সেবার প্রেরণা নিয়ে ডাক্তারদের নিজেদের ‘ওয়াকফ’ করা প্রয়োজন। ওয়াক্ফ করে এগিয়ে আসা উচিত আর এটিই পরিশেষে তাদেকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করবে আর তাদের উপর এত কল্যাণ বর্ষিত হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার ‘রহমানিয়্যাত’ বৈশিষ্ট্য তাদের উপর প্রতিফলিত হবে। অভাবনীয় ভাবে আল্লাহ্ তাআলা রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তিনি কিভাবে সাহায্য করেন সে-সম্পর্কে পূর্বে আমি দু’টি ঘটনা বর্ণনা করেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, “রহমান শব্দের নিজস্ব একটি বিশেষ অর্থও রয়েছে..........আর তা হচ্ছে, ঐশী প্রজ্ঞার দাবীও যোগ্য প্রকৃতির যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে **‘রহমান’ বৈশিষ্ট্যের যে কল্যাণ ও উপকার রয়েছে তা আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় মানুষও লাভ করছে আর জীব-জন্তুও; আর অহরহ লাভ করছে অথবা যারই প্রয়োজন তার জন্য এটি সর্বজনীন কল্যাণ”** তিনি বলেন, “ঐশী প্রজ্ঞার দাবী এবং সৃষ্টির যোগ্যতানুসারে তা লাভ হচ্ছে, সম-বন্টন হিসেবে নয়। এই রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্য মানুষ অথবা জীব-জন্তুর শক্তি-বৃত্তি, কাজ-কর্ম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই বরং এটি আল্লাহ্ তাআলার পরম অনুগ্রহ।” অতএব এ কল্যাণ সর্বব্যাপী আর প্রত্যেকেই তা লাভ করছে।

পুনরায় বলেন, “যার পূর্বে কারো কোন কর্মও বর্তমান ছিল না আর এটি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে একটি সর্বময় রহমত, এতে দুর্বল বা সবল মানবের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই। সারকথা হলো, রহ্মানিয়্যাত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণধারা কোন কর্মের প্রতিফল নয় আর কারো যোগ্যতারও ফসল নয়।” এই ফল যে লাভ হচ্ছে তা কারো কোন অধিকার বলে নয়। “**বরং এটি খোদা তাআলার একটি বিশেষ কৃপা যাতে আনুগত্য আর অবাধ্যতার ভূমিকা নেই।**” আল্লাহ্ তাআলার অনেক সৃষ্টি আছে যদ্বারা বিশ্বাসী, অবাধ্য বরং আল্লাহ্র সাথে অংশীবাদী মুশরেকরাও উপকৃত হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন যে, আমি ক্ষমা করবো না। “**এই কল্যাণধারা সর্বদা খোদা তাআলার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়। এতে আনুগত্য, ইবাদত, খোদাভীতি ও তাক্ওয়ার কোন শর্ত নেই। সৃষ্টির সৃজন ও তার কর্ম, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং তার কোন কিছু চাওয়ার পূর্বেই কল্যাণধারার ভিত্তি রাখা হয়েছে। সে কারণে মানব এবং জীব-জন্তুর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই এ কল্যাণের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যদিও এ কল্যাণধারা সৃষ্টির সকল ধাপ, স্থান কাল এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা সকল অবস্থায় অব্যাহত থাকে।**” এই কল্যাণধারা সর্বাবস্থায় প্রবহমান। আনুগত্য করো, পাপ করো, অবাধ্যতা করো সর্বাবস্থায়ই রহমান রয়েছে। তিনি বলেন, “আপনি কি দেখেন না যে, খোদা তাআলার রহমানিয়্যাত পুণ্যবান এবং অত্যাচারী সবার উপর বিস্তৃত। আপনারা দেখেছেন যে, তাঁর চাঁদ এবং সূর্য বাধ্য-অবাধ্য সবার জন্যই উদিত হচ্ছে। খোদা

প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থানুযায়ী গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এসব বিষয়াদির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের আয়োজন খোদা করছেন না, তা-সে আকাশেই হোক বা পৃথিবীতেই। তিনিই তাদের জন্য গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন আর সেই গাছ-পালা থেকে ফুল-ফল আর সুগন্ধি সৃষ্টি করেছেন। এটি এমন রহমত যা আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির জন্য সৃষ্টির পূর্বেই তাদের জন্য সরবরাহ্ করেছেন। এতে খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ এবং স্মারক রয়েছে। কোন কর্ম আর অধিকার ছাড়াই এই পুরস্কার সেই পরম দয়ালু ও মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে লাভ হয়েছে, সেই মহামহিমের পক্ষ থেকে এরূপ আরো অনেক নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে যা গণনাতীত। উদাহরণস্বরূপ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাধ্যম উদ্ভাবন করা আর প্রত্যেক রোগের জন্য চিকিৎসা ও ঔষধের আয়োজন করা, রসূলদের প্রেরণ এবং নবীদের উপর ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করা, এগুলো সব আমাদের অযাচিত-অসীম দাতা পরম দয়ালু প্রভু-প্রতিপালকের রহমানিয়্যাত বা কৃপা। এটি সাকুল্যই দান যা কোন কর্মীর কর্ম বা আহাজারি অথবা দোয়ার ফল নয়। (ইযাজুল মসীহ্-রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড, ৯২-৯৫ পৃষ্ঠা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কৃত তফসীর, ১ম খন্ড ৪২-৪৪পৃষ্ঠা)।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেছেন, পরম দয়ালু খোদা যেরূপে আমাদের জাগতিক চাহিদা পূর্ণ করেছেন আর সে নিমিত্তে আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিষ প্রদান করেন আর তাঁর এই কল্যাণ সর্বজনীন, তাঁর সৃষ্টি বিভিন্ন বস্তু থেকে ধনী-দরিদ্র সবাই সমান অংশ লাভ করছে; এইভাবে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেও খোদা তাআলা স্বীয় রহমানিয়্যাতের গুণে মানবের সংশোধনকল্পে আর তাদেরকে পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নবুয়ত ও রিসালতের ধারা চলমান রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনের অগণিত আয়াতে এ ‘রহমান বৈশিষ্ট্যের’ উল্লেখ রয়েছে আর এর বরাতে অনেক স্থানে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। নবীরাও যখনই পুণ্যের উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এই ঘোষণাই করেছেন ‘আমরা তোমাদেরকে যে সকল পুণ্যের কথা বলছি, আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছি, সেই অনুগ্রহশীলের প্রতি আহ্বান করছি, দয়ালু খোদার দিকে ডাকছি এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না বরং এসব কিছু তোমাদের মঙ্গলার্থে। তোমাদের বলা হচ্ছে, কেবল এই জাগতিক নেয়ামতরাজিকেই উপভোগ করবে না! অকৃতজ্ঞ হয়ো না বরং তাঁর প্রতি সমর্পিত হও। একথা সঠিক যে, খোদা তাআলার রহমানিয়্যাতের বিকাশ এ বিশ্বে সবার জন্য আর সদা তিনি প্রদর্শন করতে থাকেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও বা না হও; কেননা তাঁর অনেক সৃষ্টি আছে যা সর্বব্যাপী। তাঁর কল্যাণধারা সকলের জন্য। কিন্তু এ সবকিছু তাঁর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমলের প্রেরণা সৃষ্টিকারী বা তাঁর প্রতি আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্র একথাই বলেছেন, অস্বীকার করা আর আমার অবাধ্যতা সত্ত্বেও তোমরা যে রক্ষা পাচ্ছ আর যা থেকে সকলেই লাভবান হচ্ছে তা এই রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন। যদি রহমানিয়্যাত না হতো তাহলে মানবের অধিকাংশ তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত। একটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে বলেন, “কাযিলিকা আরসালনাকা ফী·উম্মাতিন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহা উমামু ল্ লিতাত্লুয়া আলাইহিমু লাযী আওহাইনা ইলাইকা ওয়াহুম ইয়াক্ফুরুনা বির্ রহ্ মানি কুল হুয়া রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মাতাব” (সূরা আর রা’দ : ৩১) অর্থাৎ, ‘এভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করেছি যার পূর্বে অনেক জাতি অতিত হয়েছে, যেন তুমি তাদের কাছে তা পাঠ করে শুনাও যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি, কেননা তারা রহমানকে অস্বীকার করে। তুমি বল, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক-প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমার বিনীত প্রত্যাবর্তন।’ এই আয়াতের দু’ আয়াত পূর্বে কাফেররা প্রশ্ন উঠিয়েছিল, আমাদের অস্বীকারের কারণে কেন আমাদেরকে নিদর্শন দেখানো হচ্ছে না? তাদেরকে তখনই এর একটি উত্তর দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াত প্রদান করেন। অনেক সময় নিদর্শনের মাধ্যমে হেদায়াত দেন। এখানে বলা হয়েছে হে অস্বীকারকারীরা তোমরা তোমাদের অস্বীকারের পর শাস্তি অথবা নিদর্শন কামনা করছো, স্পষ্টভাবে জেনে রাখো, খোদা তাআলার রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্য এই নিদর্শনকে বিলম্বিত করছে; আর তোমরা একথা বলছো যে, আল্লাহ্ তাআলা নিদর্শন কেন প্রদর্শন করছেন না? এটি কেবল এ জন্য হচ্ছে না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অবকাশ দিচ্ছেন বরং তাঁর অপার করুণার বিকাশ দেখাচ্ছেন। যদি এই বৈশিষ্ট্য না হতো তাহলে তোমাদের অপকর্মের ফলশ্রুতিতে কবেই আমি তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিতাম। এরপর হযরত মূসা (আ:)এর জাতির উল্লেখ রয়েছে। যখন তারা পরম দয়ালু খোদাকে পরিত্যাগ করে গোবৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল তখন হযরত হারুন (আ:) তাদেরকে পরম করুণাময় খোদার দোহাই দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, **ওয়ালাক্বাদ ক্বালা লাহুম হারূনু মিন ক্বাবলু ইয়া ক্বওমি ইন্নামা ফুতিনতুম বিহী ওয়া ইন্না রাব্বাকুমু র্ রহমানু ফাত্তাবিউনী ওয়া আতী’উ আমরী” (সূরা ত্বাহা: ৯১)** এর অর্থ হচ্ছে, হারূন ইতোপূর্বে তাদেরকে বলেছিল, হে আমার জাতি এর দ্বারা নিশ্চয় তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকপ্রভু অযাচিত অসীমদাতা, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ পালন করো। হযরত হারূন এই কথাই বলেছিলেন, পরম দয়ালু খোদাকে পরিত্যাগ করে এই পরীক্ষা আর বিপদে কেন পতিত

হচ্ছ। গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে শির্ক করে কেন আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ? এত নিদর্শন প্রদর্শন আর নিয়ামত প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না। আল্লাহ্ তাআলার পরম অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে তাঁর রহমানিয়্যাতের ঝলক দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন সময়ে তোমাদের দেখিয়েছেন আর তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে একটি অন্তসারশূন্য বস্তুকে উপাস্য বানিয়েছ। আল্লাহ্ তাআলার রহমানিয়্যাত বৈশিষ্ট্যের কারণে তোমরা বেঁচে আছ নতুবা এরূপ কর্মকান্ড তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক। এটি অনেক বড় অন্যায় যার ফলে ধ্বংস হতে পারো। আবার বলেন বিবেক-বুদ্ধি খাটাও আর আমার অনুসরণ করো। আমার কথা মান্য করে সঠিক পথে ফিরে আসো। এটি রহমান খোদার অনুগ্রহ যা বিভিন্ন সময়ে নবীদের মাধ্যমে জাতিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে আঁ হযরত (সাঃ)কে সমগ্র বিশ্বের হেদায়েত প্রদানের লক্ষ্যে আবির্ভূত করেছেন, তারপর বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করে পথপ্রদর্শন করেছেন। সূরা ফুরকানে বর্ণিত হয়েছে যে, **“ওয়া ইযা ক্বিলা লাহুম সুজুদু লির্ রহমানি ক্বালু ওয়া মার্ রহমানু আনাস্‌জুদু রিমাতা’মুরুনা ওয়া যাদাহুম নু ফয়া (সূরা আল্ ফুরকান:৬১)** অর্থাৎ, ‘এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান এর সমীপে সিজদাহ্ করো; তখন তারা বলে, ‘রহমান’ আবার কে? আমরা কি তাকে সেজদাহ্ করবো যার সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছ। বস্তুত: এই কথা তাদের ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দেয় এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, **“তাবারাকাল্লাযী জায়ালা ফিস্‌সামায়ে বু রূজাওঁ ওয়া জায়ালা ফীহা সিরাজাওঁ ওয়া ক্বামারাম্ মুনীরা। ওয়া হুয়াল্লাযী জায়ালাল্ লাইলা ওয়ান্নাহারা ফিলফাতাল্ নিমান আরাদা আঁইয়াযুযাক্কারা আও আরদা শুকুরা” (সূরা আল্ ফুরকান : ৬২-৬৩)** অর্থাৎ তিনি পরম কল্যাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে তারকারাজির জন্য কক্ষসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং এতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনি ও দিবাকে পরস্পরের পশ্চাদ্ধাবনকারী করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির উপকারার্থে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা সকৃতজ্ঞ বান্দা হতে চায়।’ আবারো বলেন, **“ওয়া ইবাদুর রহমানিল্লাযী ইয়ামশুনা আলাল্ আরযে হাওনাওঁ ওয়া ইযা খাতাবাহুমু ল্ জাহিলুনা ক্বালু সালামা” (সূরা আল্ ফুরকান: ৬৪)** অর্থাৎ, ‘এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তারা, যারা ভু-পৃষ্ঠে নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা উত্তরে বলে, ‘সালাম’।’

এ আয়াতগুলোতে কাফেরদেরকে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তোমরা রহমান খোদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ যে তিনি কে? রহমান খোদা তিনি যিনি আকাশে সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন যা তোমাদের জন্য লাভজনক। চাঁদ এবং সূর্যের আলোর সাথেই তোমাদের ও উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কযুক্ত। তোমাদের ইহজীবনও রহমান খোদার সাথেই সম্পৃক্ত আর তোমাদের আত্মিক জীবনও এই রহমানের সাথেই সম্বন্ধযুক্ত। এ যুগেও যা আমাদের যুগ এই প্রশ্নই উত্থাপিত হয়; মুখে না হলেও কাজে, স্বীয় কর্মে বর্তমান কালেও আঁ হযরত (সাঃ)-এর আকৃতিতে যে আধ্যাত্মিক সূর্য আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে উদিত হয়েছিল আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে প্রেরণ করেছেন; তাঁর থেকে জ্যোতি নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও পরবর্তীদের মাঝে সেই জ্যোতির বিস্তার করেছেন। তাই এ-যুগেও তাঁকে গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা যিনি এই চাঁদকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে গ্রহণ কর নতুবা যেভাবে আমি বলেছি, অমান্যকারীরাও কার্যতঃ আজকাল এই প্রশ্নই করছে যে, ‘রহমান’ খোদা কে? এক দিকে বলছে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয়, কোন সংস্কারকের প্রয়োজন, কোন নবীর আগমন আবশ্যক। অন্যদিকে কার্যতঃ আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ)-এর যুগের পর, সেই জ্যোতির পরে দীর্ঘ সময় একটি অন্ধকার ছায়া বিরাজ করছিল, এখন পুনরায় এ যুগে সেই অন্ধকারের পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর জ্যোতি প্রদান করেছেন। এটি ‘রহমান’ খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত আলো। আল্লাহ্ তাআলার এই যে, ‘রহমানিয়্যাত’ বৈশিষ্ট্য একে অস্বীকারের পরিবর্তে এথেকে উপকৃত হও এবং গ্রহণ করো। যদি না করো তাহলে যেভাবে আমি বলেছি, অজ্ঞাতে খোদার এই বৈশিষ্ট্যের অস্বীকার হবে। আমরা সেই সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা মানার তৌফিক দিয়েছেন, কিন্তু কেবল এতেই সন্তুষ্ট হবেন না, বরং এখন এটি আমাদের দায়িত্ব আমাদের জন্য নির্দেশ: নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খোদার ইবাদত কর। ইবাদতের উপর জোর দাও আর একান্ত কোমলতা, নম্রতা ও সালামের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের আস্ফালনের উত্তর দাও। তাদের জন্য দোয়া করো কেননা এটিই রহমান খোদার বান্দাদের কাজ।

যে সকল আয়াত আমি পূর্বে পাঠ করেছি তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, **“ওয়া ইযা ক্বিলা লাহুম সুজুদু লির্ রহমানি ক্বালু ওয়া মার্ রহমানু আনাস্‌জুদু রিমাতা’মুরুনা ওয়া যাদাহুম নু ফয়া “তাবারাকাল্লাযী জায়ালা ফিস্‌সামায়ে বু রূজাওঁ ওয়া জায়ালা ফীহা সিরাজাওঁ ওয়া ক্বামারাম্ মুনীরা। ওয়া হুয়াল্লাযী জায়ালাল্ লাইলা ওয়ান্নাহারা ফিলফাতাল্ নিমান আরাদা আঁইয়াযুযাক্কারা আও আরদা শুকুরা। “ওয়া ইবাদুর রহমানিল্লাযী ইয়ামশুনা আলাল্ আরযে হাওনাওঁ ওয়া ইযা খাতাবাহুমু ল্ জাহিলুনা ক্বালু সালামা” (সূরা আল্ ফুরকান: ৬১-৬৪)।**

এ সকল আয়াত লেখার পরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, **“অর্থাৎ কাফের, ধর্মহীন এবং নাস্তিকদের বলা হয় যে, তোমরা ‘রহমান’ কে সিজদাহ্ করো, তারা রহমানের নামের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন করে যে, রহমান আবার কে? (পুনরায় উত্তরে বলেন) ‘রহমান হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী এবং সমস্ত মঙ্গলের চিরস্থায়ী উৎস।”** অর্থাৎ, তিনি অশেষ কল্যাণের

সত্তাধিকারী আর তাঁর থেকেই সকল মঙ্গল আর আশিস উৎসারিত হয় যা চিরস্থায়ী। **“যিনি আসমানের বুরূজসমূহ বা সু বৃহত কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সেই সব বুরূজে সূর্য এবং চন্দ্রকে স্থাপিত করেছেন যারা সকল সৃষ্টিকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে আলো বিতরণ করছে সেই ‘রহমান’-ই তোমাদের জন্য অর্থাৎ সকল মানব সন্তানের জন্য দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যা একে অপরের পরে আসে’ যাতে করে মা’রেফাত বা তত্ত্ব জ্ঞানের সন্ধানীরা, এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা বা হিকমত থেকে লাভবান হতে পারে”** এর প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের সুগভীর কথামালা থেকে উপকৃত হতে পারে। অজ্ঞতা এবং উদাসিনতার পর্দা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এবং যে ব্যক্তি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তৎপর সে যেন কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে। ‘রহমানের প্রকৃত পূজারী তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে।” প্রথম: আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের ফলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর এদিকে অনেক বেশী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। এরপর বলেন “রহমান এর প্রকৃত পূজারী তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রতর সঙ্গে চলাফেরা করে।” যে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং বিনয়ের সাথে জীবন-যাপন করে, “এবং যখন অজ্ঞরা কঠোর ভাষায় কথা-বার্তা বলে তখন তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কথার জবাব দেয়।” অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোর আচরণ করে তাহলে সালাম বলে কোমলতা আর দয়ার বাক্যে প্রতি উত্তর প্রদান করে। “অর্থাৎ, কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা দেখায় এবং গালির পরিবর্তে দোয়া করে।” আহমদীরা অজস্র গালিগালাজ শুনে থাকে, গালির উত্তরে গালি দেয় না বরং দোয়া করে “আর রহমান গুনের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে।” তারা আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী প্রকাশের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। “কেননা, ‘রহমান’ও ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সূর্য চন্দ্র এবং অন্যান্য অসংখ্য নিয়ামত দ্বারা উপকৃত করেন।

অতএব এই আয়াতগুলোতে খোদা তাআলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, ‘রহমান’ শব্দটি এই অর্থেই খোদা তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয় যে, তাঁর সর্বব্যাপী রহমত ভালোমন্দ নির্বিশেষে সকলকে পরিবেষ্টন করছে। যেমন আরো একস্থলে এই সর্বজনীন রহমত সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন; ‘আযীবু উসিবু বিহী মান আশাউ ওয়া রহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইঈন’ (সূরা আল্ আ’রাফ: ১৫৭) অর্থাৎ আমি যাকে চাই তাকে শাস্তি দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।” আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহমানিয়্যাতের কারণে ক্ষমার প্রতি বেশী আকর্ষিত।

“আবার এক জায়গায় বলেছেন, **‘কুল মাইঁ ইয়াক্ লাউকুম বিল্লাইলে ওয়ান্ নাহারে মিনার্ রহমান’ (সূরা আল্ আম্বিয়া: ৪৩) অর্থাৎ, ঐ অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদের বলে দাও যে, যদি খোদা তাআলার মধ্যে ‘রহমানিয়্যাত’ এর গুণ না থাকতো তাহলে, তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অন্য কথায়, তাঁর রহমনিয়্যাতই ঐ সমস্ত কাফের ও বেঈমানদেরকে অবকাশ দিযে থাকে, আর তড়িঘড়ি তাদের ধৃত করেন না।”** অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কেবল জামাতের উপরেই নয় ব্যক্তিগতভাবে আহমদীদের উপর অনেক বেশী অত্যাচার হচ্ছে, কেন আযাব আসছে না? সত্য কথা হলো; আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহমানিয়্যাতের বিকাশ ঘটাচ্ছেন।

“আরো একস্থানে এই রহমানিয়্যাতের দিকে ইঙ্গীত করে বলা হয়েছে; ‘আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাত্তয়রে ফওকাহুমু হু ছফ্ফাতিওঁ ওয়া ইন্নাক্বিনা, মা ইউমইসকু হুন্না ইলার্ রহমান’ (সূরা আল মূলক:২০) অর্থাৎ, তারা কি তাদের উর্ধ্ব দেশে পাখিদেরকে দেখে না যে, ওরা কিভাবে ডানাগুলিকে বিস্তার করে উড়ছে এবং সেগুলিকে আবার গুটিয়ে নিচ্ছে? রহমান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ওদেরকে ধরে রাখছে না।” (বরাহীনে আহমদীয়া রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, ৪৪৭-৪৫০পৃষ্ঠা, পাদটীকা-১১)

সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার এই যে কল্যাণধারা তা সকল পশু পাখি, পুরো প্রাণী জগতের উপর ছেয়ে আছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই রহমান খোদাকে চিনার তৌফিক দিন। তাঁর সর্বজনীন কল্যাণ ও তাঁর রহমত যা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছে তা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের প্রতি আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষকারী হোক, তারপরে সেই কল্যণধারাকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে নিষ্ঠার সাথে আমরা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রদানকারী হই। ঐ সকল লোকদের সংশোধনেরও চিন্তা করুন। যারা আমাদেরকে গালি গালাজ করবে (ইনশাআল্লাহ্তাআলা)। হৃদয় একদিন নরম হয়ে যাবে আর ইনশাআল্লাহ্ হবেই। এই বিষয়েও অনেক দোয়া করা প্রয়োজন, সাধারণভাবে মানবতার জন্য যেন তারা সত্যকে চিনতে পারে, আর বিশেষভাবে উম্মতে মুসলেমার জন্য, যারা নিজেদেরকে ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণে তাদেরকে ধ্বংস আর বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করুন।

সানী খুতবায় হুযুর (আইঃ) বলেন, একটি দোয়ার জন্য অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম, ইনশাআল্লাহ্ দু’তিন দিনের মধ্যে জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। সেখানে তারা অনেক জামাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সবদিক থেকে এই সফর কল্যাণমন্ডিত করুন। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা ২৮শে ডিসেম্বর কাদিয়ান জলসার সমাপ্তি ভাষণও সেখান থেকেই প্রদান করা হবে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা সফরকে বাবরকত করেন আর অনুষ্ঠানাদীও সর্বতোভাবে সফল করেন।

(হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)

জীবন্ত খোদার অস্তিত্ব ও তার প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহবশত: কুরআন মজীদে নিজের সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

“তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা’বুদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা; অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্ববধায়ক। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পেতে পারে না, তবে হ্যাঁ, তিনি দৃষ্টির নাগাল পেয়ে থাকেন; তিনি সূক্ষ্মতি সূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত।” (সূরা আনআম : ১০৩-১০৪)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সদা জাগ্রত তিনি চির জীবন্ত-জীবন দাতা তিনি কখনও ঘুম বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। সৃষ্টির সব কিছু সারাক্ষণ তাঁর দৃষ্টির মধ্যে বা তাঁর আওতা বা ক্ষমতার মধ্যে; ধরতব্যের মধ্যে। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা বাকী সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর আয়ত্বের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হয় না, হতে পারে না, থাকতে পারে না। কারণ তিনি ব্যতীত সবাই মরণশীল।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ। তিনি স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের বিকাশ না ঘটালে আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না। কোন দৃষ্টি তাঁকে ধরতে বা পৌঁছতে পারে না। তিনি নিজেই নিজের উপস্থিতি এবং ক্রিয়াশীল হওয়ার প্রমাণও প্রকাশ করছেন সারাক্ষণ।

“কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান” (সূরা রহমান ঃ ৫৫.৩০) প্রতিদিন তিনি নতুন নতুন মহিমায় প্রকাশিত হন।

প্রত্যেক যুগে তিনি নতুনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

‘কুরআন মজীদ খোদাতাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ বা নাযেলকৃত কিতাব’-এ কথাটি আমার কাছে জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কুরআন মজীদে নিজেকে খুব চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। এতে এত সুস্পষ্ট করে আল্লাহ্ তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করেছেন যে, খুব সহজে তাঁকে চেনা ও জানা যায়।

জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রথমতঃ কুরআন শরীফ, দ্বিতীয়তঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাঝে তৃতীয়তঃ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

কুরআনের প্রত্যেক আয়াত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। এমনকি হুরুফে মুকাত্তিয়াতগুলোতেও যেমন ‘আলিফ লাম মিম’ ‘আলিফ-লাম মিম-রা’-এ জাতীয় আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলেও জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রামাণ পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে জীবন্ত খোদার প্রমাণ আছে। সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান ও প্রকাশিত। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যেও আল্লাহ্ তাঁর অস্তিত্বে সাক্ষ্য প্রমাণ রেখেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে: “এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানদের কাছ থেকে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধর গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করালেন (এই বলে যে,) ‘আমি কি তোমাদের প্রভূ নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি।” ....” (আল আ’রাফ ৭ ঃ ১৭৩)

সৃষ্টির গোড়াতে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে লিখে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ আমাদের পরম প্রভু। আমরা কখনও তাঁকে অস্বীকার করতে পারব না।

এর সত্যতার প্রমাণ এই যে, যে কোন মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, যেমন নদীতে পড়ে যায়, ডুবতে বসে তখন সে রাম-রাম বা ও মায় গড, বা আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে চিৎকার করতে থাকে। কেন সে এমন করে? অজানা এক মহা শক্তিকে ডাকে কেন? খোদা তার প্রকৃতির মধ্যে স্বীকৃতি রেখেছেন যে, কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই রক্ষা করতে পারেন।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

নিশ্চয় আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃজনের মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (আল ইমরান , ৩ ঃ ১৯১)

সৃষ্টির উপর বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। তারা অনেকে বিবেকের তাড়নায় স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, এ মহা বিশ্বের সৃষ্টির পেছনে “এক খোদা”-র হাত রয়েছে। তারা স্বীকার করেছেন যে, সৃষ্টির মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একজন কেউ এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় বার বার প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু পাদ্রীদের ভয়ে প্রকাশ করতে সাহস করতেন না। তবুও মাঝে মাঝে কেউ কেউ সাহস করেছেন, যেমন বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইযাক নিউটন। তিনি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজের প্রফেসার ছিলেন। জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করাতে তাকে চাকরীচ্যুত করা হয়েছিল।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও স্বীকার করে ছিলেন। প্রফেসার ডাঃ আব্দুস সালাম এ যুগের অনেক বড় বিজ্ঞানী। তিনি তো রীতিমত নামায রোযা করতেন।

এবার কুরআনের কথায় আসুন। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী আল্লাহ্‌র কালাম। আমরা যা কিছু জেনেছি তার সবটুকু কুরআন থেকেই জেনেছি। কুরআন মজীদের মত এত সত্য, এত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য আর কোন ডকুমেন্ট নাই। কুরআনে দাবী করে খোদাতাআলা বলেছেন যে, তিনিই এই

কিতাব নাযেল করেছেন এবং এ দাবীর পক্ষে দলিল এই যে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন :

“যদি তোমরা এ সম্বন্ধে সন্দেহে থাক আমরা আমাদের বান্দার উপর যা নাযেল করেছি তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস.........” (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৪)

কুরআন মজীদের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত এত চমৎকার ভাষা এত গভীর জ্ঞান-ভান্ডার সম্বলিত যে, কোন মানুষ এরকম রচনা করতে পারবে না। এটা এর সত্যতার বড় প্রমাণ। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। কুরআন মজীদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অনেক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছেন। অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ভবিষ্যৎকালের অনেক ঘটনা সম্পর্কে। এখানে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

অতীতকালের একটি ঘটনা হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা। আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়ে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মিশর ছেড়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছিলেন। ফেরাউন ঐ যুগের মিশরের ক্ষমতাশালী শাসক-মিনফাতাহ্ বা মেনফাতাহ্ হযরত মূসা (আঃ)-এর পেছনে পেছনে তার বাহিনী সাথে নিয়ে ছুটল যে, মূসা ও তার লোকদের যেতে দেয়া হবে না। আল্লাহ্‌র তকদীর, মূসা (আঃ) তো নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু ফেরাউন ভরা নদীতে ডুবে গেল। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, ফেরাউন ডুবে গেলেও তার সৈন্য বাহিনী তাকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে আনে এবং চিকিৎসার পরে সে বেঁচে উঠেছিল। পুরোপুরি সুস্থ্য না হলেও পঙ্গু অবস্থায় আরো প্রায় ৬০ বছর বেঁচে ছিল। প্রায় ৯০ বছর বয়সে মারা যায়। মিশরের কায়রো যাদুঘরে তার মরদেহ রক্ষিত আছে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

“অতএব আজ আমরা তোমার মরদেহ দ্বারাই রক্ষা করব তোমাকে যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য এক নিদর্শন হও” (সূরা ইউনুস : ৯৩)

কুরআন শরীফে এ আয়াত নায়েল হয়েছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রায় দু হাজার বছর পরে। অন্য কোন কিতাবে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে এমন কথা বলতে পারে? হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোথা থেকে জানতে পারেন নি এ কথা। অবশ্যই আল্লাহ্ কুরআনে এ আয়াত নাযেল করেছেন এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। আজকে ফেরাউনের মরদেহ আবিষ্কৃত হয়ে প্রমাণ হয়েছে যে, কুরআন অবশ্যই গায়েবের খবর সম্বলিত আল্লাহ্‌র কালাম। কুরআন শরীফ নাযেলের পূর্বের এ রকম অনেক মূল্যবান তথ্য কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্য নবীগণ সম্পর্কে অনেক মহাগুরুত্বপূর্ণ কথা বা তথ্য অন্য কোথাও সঠিক ভাবে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু সমস্ত জরুরী তথ্য, সঠিক তথ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নাই।

এখানে কুরআন শরীফের আরো দু’একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করব যা কুরআন মজীদ নাযেল হওয়ার সময় ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বর্ণিত হয়েছে–আজকের যুগে সেগুলোর সত্যতা ও বাস্তবায়ন আমরা দেখছি। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

“তিনি দুই সমুদ্রকে এভাবে প্রবহিত করেছেন যে, তারা উভয়ে প্রচন্ড বেগে মিলিত হবে।” (সূরা রহমান ঃ ২০) যখন কুরআন নাযেল হয়েছে। তখন ঐ যুগের মানুষ কিছুই বুঝতে পারেনি যে, এটা কী ভাবে হবে। আমরা আজ দেখছি যে সুয়েজ খাল খনন করে ভূমধ্য সাগর ও লহিত সাগরকে মিলানো হয়েছে। পানামা খাল খনন করে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরকম আরো বহু বহু ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূর্ণতা পেয়েছে। বিশেষ করে শেষের সূরা গুলো দেখুন। যেমন সূরা তাকভীর দেখুন। সেখানে প্রত্যেক আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং বর্তমান যুগে সেগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

ওয়া ইযাল এশারু উত্তলাত; যখন দশ মাসের গর্ভবতী উঠনীগুলো বেকার পরিত্যক্ত হবে। আজ আধুনিক যান বাহন মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক রেলগড়ী বিমান চলছে; উটের প্রয়োজন নাই। (সূরা তাকভীর, ৮১ ঃ ৫)। আঁ হযরত (সাঃ)ও বলেছেন যে

হযরত ইমাম মহদী (আঃ)-এর যুগে এটা হবে যে উট পরিত্যাক্ত হবে (মুসলিম শরীফ, বাব নযুলে ঈসা)

এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা হয়েছে যেকোন সময় ফেটে যাবে এবং পৃথবীতে মহাধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে। যেমন দেখুন :

(ক) সেদিন আকাশ স্পষ্ট ধুয়া নিয়ে আসবে অর্থাৎ আকাশ ধুয়ায় ভরে যাবে। (সূরা দুখান, ৪৪ : ১১)

(খ) সেদিন আকাশ হবে বিগলিত তাম্রের ন্যায় (সূরা মা’রেজ : ৯)

(গ) তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নিশিখা এবং গলিত তাম্র পাঠানো হবে তখন (এর থেকে বাঁচানোর জন্য) তোমরা একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না।

এখানে সংক্ষেপে ইশরা করলাম নতুবা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। (সূরা রহমান, ৫৫ ঃ ৩৬)

বোমা বিস্ফোরণ হলে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হবে।

অতএব, কুরআন এমন কিতাব না যা কেবল অতীতের কাহিনী বলে এবং নামায রোযার কথা বলে। আজ বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োগ নাই। বরং কুরআনে সকল যুগের জন্য প্রয়োজনীয় সব কথা বলা হয়েছে। মানব জাতির উন্নতি কিভাবে হবে, আর ধ্বংস কিভাবে হবে, কেন হবে, এর থেকে রক্ষার কী উপায় সবই বলা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের প্রতি মনোযোগী হওয়া

আবশ্যক। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এ যুগে আবির্ভূত মসীহ্ ও মাহ্দী বলেছেন :

অনুবাদ : ইসলাম জীবন্ত ধর্ম এবং আমাদের কিতাব (কুরআন) জীবন্ত কিতাব। আমাদের খোদা জীবন্ত খোদা এবং আমাদের রসূল জীবন্ত রসূল। তারপর এসবের কল্যাণ ও আলো এবং প্রভাব কি করে মৃত হতে পারে।" (আল হাকাম, ৩১ অক্টোবর, ১৯০৫ইং)

অতএব কুরআনে বর্ণিত এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রমাণ করে যে, কুরআন আলীমুল গায়েব খোদার পক্ষ হতে নাযেল হয়েছে। জীবন্ত খোদা যুগে যুগে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন।

এবার জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের যে প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাই সে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্র নবীগণ (আঃ)। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতিকে স্রষ্টার ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য নবী প্রেরণ করেন যুগে যুগে। নবীগণ এসে যুগে যুগে জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি নিজ বাণী (ওহী) নাযেল করেন এবং মানুষ যেন অবশ্যই ঈমান আনতে পারে সেজন্য নিদর্শন এবং মোজেযা প্রদর্শন করেন। এরকম এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীগণ আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর মুশরেক জাতিকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে বললেন এবং তাঁর জাতি অস্বীকার করে বসল। শুধু তাই নয়, অবশেষে তারা হযরত ইব্রহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কিন্তু আগুনে পুড়ে মরার ভয়ে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করা থেকে বিরত হন নি। জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রতি কত দৃঢ় ঈমান হলে একজন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। তারপর কী হলো? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে তারা অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করল। তখন তার জীবন্ত খোদা কী করলেন? বললেন :

"ইয়া নারো কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম" (সূরা আম্বিয়া : ৭০)। হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

আজকের যুগে আল্লাহ্র প্রেরিত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দাবী করেছেন যে, যদি তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সে আগুনও নিভে যাবে, তাঁকে জ্বালাবে না।

ইনিই সেই জীবন্ত খোদা, সকলের খোদা, অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের)ও খোদা, মোমেন মুসলমানদেরও খোদা, সবাইকে তিনি অন্ন দান করেন।

ইহুদীরা অর্থাৎ বনি ইসরাঈলীরা হযরত ঈসা (আঃ)কে ক্রশবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ কি করেছিলেন?

আল্লাহ্ বলেছিলেন : "মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকেরীন"তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ্ ও পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্ অবশ্যই উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণকারী।" (সূরা আলে ইমরান, ৫৫)

তারা তো ক্রশে চড়িয়ে দিল হযরত ঈসা (আ:)কে। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে ক্রশ বিদ্ধ হয়ে অভিশপ্ত মৃত্যু দান করেন নি। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)কে "ওয়া আওয়ানাহুমা ইলা রাবওয়াতিন তিনি ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা মারিয়মকে উচ্চু টিলার উপর স্থান করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কাশ্মীরে। (সূরা মুমেনুন, ২৩ঃ ৫২

প্রত্যেক নবী-রসূল আল্লাহ্তাআলার মনোনীত ও ওহী প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাঁর নবীকে বিজয় দান করেন। নবীগণের ইতিহাস দেখেন। পৃথিবীর মানুষ কখনই প্রথম সময় নবীকে সহজে গ্রহণ করেনি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় অবশেষে মানুষ নবীগণকে অবশ্যই গ্রহণ করেছে। নবী অবশ্যই জয়যুক্ত হয়েছেন। জীবন্ত খোদা ব্যতীত কেউ নবীকে সাহায্য করে না।

এবার আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর কথা বলছি।

হযরত মুহাম্মদ মহানবী, সর্বশ্রেষ্ট নবী, শেষ শরীয়ত বহনকারী নবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের বড় স্পষ্ট প্রমাণ। যে কোন বিবেকবান মানুষ হুযূর (সাঃ)-এর জীবনের যে কোন ঘটনার উপর নজর দিলে সে বুঝবে যে, হুযূর (সাঃ)-এর সাথে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র সক্রিয় সমর্থন থাকত।

মক্কায় অবস্থানকালে, হিজরতের পূর্বে যখন হুযূর (সাঃ) বাহ্যিক দৃষ্টিতে বড় দূর্বল ছিলেন, অসহায় ছিলেন–সেই যুগেই বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। শেষের সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ নাযেল হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ঘটনার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা হুযূর (সাঃ)কে জানিয়ে দিতেন যে, কি ঘটতে যাচ্ছে। হিজরতের পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছে যে, এখন হিজরত করে যেতে হবে। তবে শীঘ্রই বিজয়ী বেশে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।

"ঐ খোদা যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে ফরয করেছেন তিনি তোমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন স্থলে ফেরত আনবেন।" (সূরা কাসাস : ৮৬)

হিজরতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত–এমনকি হিজরতের পরের প্রতিটি যুদ্ধ এবং কেবল যুদ্ধ নয় বরং শত শত ঘটনা, হুযূর (সাঃ)-এর জীবনের সকল ঘটনা জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ। পদেপদে, প্রতি নিয়ত হুযূর (সাঃ) কে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তারা সাহায্য করেছেন। কুরআন বলছে : "লাহু মুয়াক্কীবাতুন মিম বায়নে ইদায়হি ওয়া মিন খালফিহিম ইয়াহ্ফাযুনাহু মিন আমরিল্লাহ্"

(এই রসূল তার জন্য তার সম্মুখে এবং তার পিছনে পরপর আগমনকারীগণের (ফেরেশ্তাদের) এক জামায়াত আছে যারা

আল্লাহ্‌র আদেশে তার হেফাযত করেছেন।" (সূরা রাদ ১৩ : ১২)

কুরআন বলছে "ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হওয়া ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহ্‌হীউন ইউহা" "এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলেন না, ইহা কেবল এমন ওহী যা তার প্রতি ওহী করা হচ্ছে।" (সূরা নজম : ৫৩ : ৪) এ কারণে হুযূর (সাঃ) এর প্রতিটি বাক্য বহু তথ্য পূর্ণ।

সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে গৃহীত হতো। এরচেয়ে জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী হতে পারে? হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বারবার হত্যার চেষ্টা করার সুকৌশল ও সুনিপুন চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু খোদা বলেছিলেন : "ওয়া ল্লাহু ইয়সিমুকা মিনান নাসে," এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের (অক্রমণ) হাত থেকে রক্ষা করবেন।" (সূরা মায়েদা, ৫৮ : ৬৮)

ইরান সম্রাট ইয়ামনের গভর্নরকে আদেশ পাঠালে যে আরবী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে গ্রেফতার করে আনতে পুলিশ পাঠাও। পুলিশ গিয়ে আঁ হুযূর (সাঃ) কে বার্তা দিল যে, আপনাকে আমাদের সাথে যাবার নির্দেশ নিয়ে আমরা এসেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন, কাল সকালে জবাব পাবে। সকালে রসূল (সাঃ) তাদের বললেন, আজ রাতে তোমাদের সম্রাটকে আমার খোদা হত্যা করেছেন। সুতরাং তোমরা ফেরত চলে যাও।" এটা জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন নয়?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক জীবন্ত রসূল যার রূহানী ক্ষমতার, রূহানী শক্তির বহি:প্রকাশ আজকেও আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি। পৃথিবীর কোন দেশ বা জাতির মানুষ কোন দিন মুহাম্মদ (সাঃ) রূহানী প্রভাবের বাইরে যেতে পারবে না। জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের এর চেয়ে সহজবোধ্য স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে? হুযূর (সাঃ) তো "রাহমাতুল্লিল আলামীন।" রহমত সমগ্র পৃথিবীর জন্য। তার জীবন্ত খোদা তাকে এভাবে সম্মানিত করেছেন যে, দুনিয়ার সকল জাতির লোকেরা একদিন তাকে আবিষ্কার করবে যে, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু ভবিষ্যদ্বাণী যা মূলত কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইনতেকালের পরে ও যুগে যুগে বাস্তবে রূপ লাভ করেছে; আজও করে চলেছে। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিতে চেষ্টা করব।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে খোদা বলেছিলেন : "ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা : নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করছি।" (সূরা ফাতাহ, ৪৮ : ২)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধীর সময় এ বিজয় ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে মক্কা বিজয়ের শুভ সংবাদ ছিল। মক্কা বিজয়ের পরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইনতেকালের কিছুদিন পূর্বে হুযূর (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর উপর সূরা নসর নাযেল হয়।

"ইযা জায়া নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু" যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে ওয়া রায়তান নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দীনিল্লাহে আফওয়াজা " তুমি দেখবে যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করবে।"

এখানে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার, প্রসার ও বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু ভবিষ্যদ্বাণী তো কোন কথা হয় না যদি এর পূর্ণতা বা বাস্তবায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা হয়। আজ আপনারা চিন্তা করে বলুন বর্তমান অবস্থায় ইসলামের বিজয় কবে হবে?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন্ত খোদা, আমাদের প্রভু ও স্রষ্টা জীবন্ত খোদা কুরআনের খোদা শুধু বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীই করেন নি। বরং এরজন্য যথেষ্ট যথোপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। এ ব্যবস্থা বিরাট ব্যবস্থাপনা, বিশাল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকান্ড যার নাম খেলাফত ব্যবস্থা। (সূরা নূরের আয়াত ইসতেখলাফে বলা হয়েছে :

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন (প্রতিজ্ঞা করেছেন) যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণেকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন............" (সূরা নূর, ২৪ : ৫৬)

আঁ হযরত (সাঃ) নিজেও বলেছেন যে, তাঁর ইনতেকালের পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ইনারা খলীফা হবেন এবং খেলাফতের যুগে ইসলাম অনেক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। হযরত নবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম সে যুগের উন্নত দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করেছে। ইতিহাস পড়ে দেখুন।

আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই হযরত আলী (রাঃ) র পরে খেলাফতে রাশেদার যুগ শেষ হয়ে যায় এবং রাজা-বাদশাহর যুগ এবং রাজত্ব আরম্ভ হয়। তারপর হুযুর (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমাদের এযুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে পুনরায় ইসলামী খেলাফত তথা আঁ হযরত (সাঃ) এর ধর্ম ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের উদ্দেশ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা জীবন্ত খোদার খুব তাজা ও সুস্পষ্ট নিদর্শন।

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলেছেন :

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে (ঐ ধর্ম ইসলাম) সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেন, মোশরেকরা যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। (সূরা সাফ্‌ফ : ১০)

এখানে বলা হয়েছে সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় হবে। তফসীরকারকগণ

লিখেছেন যে, এ বিজয় ইমাম মাহদী (আঃ) হাতে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে সূরা জুমআর ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) রূহানীভাবে পুনরায় আবির্ভূত হবেন। ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবিহিম : "এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্য লোকদের মধ্যে যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই।"

সুরা সফফ এবং ১০ আয়াতে একজন রসূলের আগমনের কথা বলা হয়েছে যার হাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয় হবে। সূরা জুমআর ৪ আয়াতে আঁ হযরত (সাঃ) রূহানী ভাবে পুনরায় আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। তথা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কথা। এই আয়াতের তফসীর আঁ হযরত (সাঃ) নিজেই করে গেছেন। সহী বুখারী কিতাবুত তাফসীরের হাদীসে দেখুন। হযরত আবু হুরায়ারা বর্ণনা করেছেন, আমরা বসেছিলাম হুযূর (সাঃ) এর মজলিসে, সূরা জুমআ নাযেল হলো এবং হযরত (সাঃ) মজলিসে এই আয়াত পড়ে শুনালেন। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাস করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কবে কোন লোকদের মাঝে আপনি পুনারায় আবির্ভূত হবেন? আঁ হযরত (সাঃ) প্রথমত জবাব দেননি। বারবার অনুরোধ করার পর হযরত সালমান (রাঃ) কাঁধে হাত রেখে বললেন :

ঈমান যদি সপ্তর্ষী মন্ডলেও উঠে চলে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয় সালমান (রাঃ) মধ্যে থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি নিশ্চয় ঈমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে...."

এখানে বলা হয়েছে পৃথিবী থেকে ঈমান তখন আকাশে উঠে গিয়ে থাকবে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু আয়াত রয়েছে। কেবল আসল ও মূল কথাটি আমি এখানে যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে, কুরআন শরীফেও সুনির্দষ্ট অনেক আয়াত আছে যাতে উল্লেখ আছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর ইনতেকালের পরে, তেরশ বছর পরে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিবিম্ব এবং ছায়া হবেন–তার আবির্ভাবই রূহানীভাবে আঁ হযরত (সাঃ) এর আবির্ভাব হবে। তাঁর মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হবে সকল ধর্মের উপর, সকল দেশ ও জাতির মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।

আজ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জামাত আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ঐ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দাবী করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, কুরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এযুগে মা'মুর করে বা আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, (ঈমানদারদের) ঈমানগুলোকে শাক্তিশালী করি এবং খোদা তাআলার অস্তিত্বকে মানুষের সামনে প্রমাণ করে দেখাই।" (রূহানী খাযায়েন, নং ১৩ পৃঃ ২৯১কিতাবুল বারিয়্যা)

এবার প্রশ্ন এই যে, এই কাজটি তিনি কিভাবে করবেন? এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

"আমার কাজ এই যে, আমি যেন ঐশী নিদর্শন সমূহের সাহায্যে পৃথিবীর বুকে তৌহীদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি।" (খুতবা জুমআ, ৫ জানুয়ারী ২০০৭ ইং)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

"খোদাতাআলা যে কাজের জন্য আমাকে মা'মুর করেছেন তা এই যে খোদা এবং বন্দার মধ্যকার সম্পর্ক যা কর্দমাক্ত বা ঘোলাটে হয়ে পড়েছে তা দূর করে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে।" (লেকচার লাহোর, পৃ: ৪৭)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে মানুষকে আল্লাহ্র পথ দেখিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাত দিয়ে ঐ আরবের বিশেষ করে মক্কা ও মদিনার মানুষ আল্লাহ্কে পেয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র জীবন্ত দিনর্শন দেখেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ আরব জাতিকে জীবন দান করেছিলেন কুরআনে বলা হয়েছে :

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন সে তোমদেরকে ডাকে, যেন সে তোমাদের জীবিত করতে পারে।" (আলা আনফাল, ৮ : ২৫)

সুতরাং হুযূর (সাঃ) এর ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন তারা নতুন জীবন লাভ করেছেন। ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

ইসলামের পূর্বে মক্কা ও আরবদের চরিত্র কী ছিল আর ইসলাম গ্রহণ করে তাদের চরিত্র কেমন হয়েছিল। কুরআন বলে তারা আল্লাহ্র প্রিয় বন্ধু আল্লাহ্ তাদের প্রিয় বন্ধু হয়েছিলেন। হুযূর (সাঃ) বলেছেন : আমার সাহাবা আকাশের তারার মত, কোন সাহাবীকে যারা অনুসরণ করবে তারা হেদায়েত পাবে।

আজকের মুসলমানরা সেসব কথা ভুলে গেছেন।

আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)এর অনুসারীরাও রূহানী জীবন লাভ করেছেন। জীবন্ত খোদার ভালবাসার সুস্পষ্ট স্পর্শ পেয়েছেন। তাদের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। নয়ত খেলাফত এতদিন কায়েম থাকত না। খলীফাও জামাতের দোয়া কবুল হতো না। বিবেকবানদের জন্য অবশ্যই এতে চিন্তার খোরাক আছে এখানে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ এসেছেন মুসলমানদের আবার একত্রিত করতে আল্লাহ্র প্রতি সুদৃঢ় ঈমান সৃষ্টি করতে যেমন বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করেছে।

"ঈমান যদি সপ্তম আকাশেও উঠে গিয়ে থাকে তিনি আবার তা নামিয়ে আনবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, যে আমাকে অকাট্য দলীল প্রমাণ দিয়ে জ্ঞান দান করেছেন এবং প্রত্যেক সময় দেয়া হচ্ছে, যা কিছু আমার উপর অবিতীর্ণ করা হয়, যে সমস্ত ওহী আমার উপর নাযেল হয় সেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয় শয়তানী ওহী হয় না।............" (তবলীগের রেশালত, ৭ম সংখ্যা, পৃ: ৬৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন :

"আমি আবির্ভূত হয়েছি যেন, খোদা আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তিনি এক প্রকার গুপ্তধন আকারে ছিলেন। তবে এখন তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন যে, সকল নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ করে দিবেন যারা বলেন খোদা নাই।

কিন্তু হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা খোদার খোজে আছ, আমি তোমাদের শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, তিনিই প্রকৃত খোদা যিনি কুরআন নাযেল করেছেন তিনিই প্রকৃত খোদা যিনি আমার উপর তাঁর জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়েছেন। এবং সর্বক্ষণ আমার সাথে আছেন।" (ইশতেহার হাকীকাতুল ওহী সংশ্লিষ্ট পৃ: ৬১৭)

হুযূর (আঃ) আরও বলেছেন ঃ

"আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দ। আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সকল প্রকার সৌন্দর্যের অধিকারীরূপে পেয়েছি। এ সম্পদ প্রানের বিনিময়ে হলেও লাভ করার যোগ্য......................" (কিস্তিয়ে নূহ, ৩১পৃঃ)

হুযূর (আঃ) আরও বলেছেন ঃ

আমি সাধারণভাবে সকলকে জানাচ্ছি যে, যে কোন মানুষ, তা সে এশিয়ান হোক অথবা ইউরোপিয়ান হোক, যদি আমার সংস্পর্শে অবস্থান করে তাহলে কিছু দিনের মধ্যে সে অবশ্যই আমার এ সকল কথার সত্যতা উপলব্ধি করবে।" (ইশতেহার, পৃ: ১৬, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ইং)। দেখুন কত বড় কথা!! এবং এটি প্রমাণিত সত্য।

ইতিহাস সাক্ষী যে, বিভিন্ন দেশও জাতির বড় বড় যোগ্য ব্যক্তিরা তার কাছে এসে অভিভূত হয়েছেন। তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটি জীবন্ত খোদার নিদর্শন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবীর সত্যতা প্রমাণ তাঁর যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর মাধ্যমে জীবন্ত খোদার নিদর্শন দেখেছেন। পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ তাঁর যুগে এ জামাতভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর খেলাফত কায়েম হয়েছে। কুরআন বলছে; খেলাফত আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ঈমানদার ন্যায়পরায়ণ লোকদের মধ্যে করবেন। এখানে খেলাফত থাকা এ কথাকে প্রমাণ করে যে, এরা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল।

পাকভারতের, বাংলাদেশের তথা বিশ্বের মুসলমানরা সাক্ষী যে, তারা চেষ্ট করেও খেলাফত কায়েম করতে পারে নি। ১৯৭৩ইং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভূট্টো লাহোরে সকল মুসলিম দেশ সমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে শাহ ফয়সালকে খলীফা বানাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কদিয়ানী (আঃ) ১৯০৫ইং সনে আল ওসীয়্যত বই লিখে দাবী করেছেন যে, তার সত্যতার প্রমাণ এই যে, তাঁর ইনতেকালের পরে অবশ্যই আল্লাহ্ তার খেলাফত কায়েম করবেন। এবং এই খেলাফতের হাতে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভ করবে। তাঁর এ খেলাফত কিয়ামত অবধি কায়েম থাকবে। হুযূর (আঃ) লিখেছেন :

"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করাও আবশ্যক। এবং এর আগমন আমাদের জন্য ভাল। কেননা এটা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। এবং এই দ্বিতীয় কুদরত (অর্থাৎ খেলাফত) আসতে পারে না যতদিন আমি না যাই। কিন্তু আমি যখন চলে যাব, তখন খোদা ঐ দ্বিতীয় কুদরতকে পাঠিয়ে দিবেন তোমাদের জন্য যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। বার বার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি হাজার হাজার ওহী ইলহাম প্রকাশ করেছেন এবং প্রকাশের পর ২৮ বছর বেঁচে ছিলেন। তারপর ৭৩ বছর বয়সে স্বাভাবিকভাবে বড় সম্মানের সাথে মৃত্যু বরন করেছেন। সকল জাগতিক শক্তি তাকে হত্যা বা অপমান করতে সকল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তারপর তাঁর খেলাফত হয়েছে। নিরানব্বই বছর হয়ে গেল তাঁর খেলাফত চলছে। বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ। তাঁর খলীফাগণকে বার বার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইতো কয়েক বছর পূর্বে হযরত মির্যা তাহের আহমদ চতুর্থ খলীফা (রাহঃ) কে জেনারেল জিয়াউল হক মিথ্যা মামলায় জড়িযে ফাঁসী দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তাদের চেষ্ট পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে দিন দিন জামাত উন্নত করে চলেছে। যরা বিরোধীতা করেছেন তারা কী পেয়েছে?

কোথায় আজ মিঃ ভূট্টো, কোথায় জেনারেল জিয়াউল হক? বিরোধীদের উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা সাহেব বারবার বলেছেন যে, তারা কোন দিন সফল হবে না। বরং ধ্বংস হবে। আল্লাহ্ তাকে বলেছেন "ইন্নি মুহিনু মান আর দা এহানাতাকা"– যে তোমার অপমানের চেষ্ট করবে তাকে আমি ধ্বংস করব।" একশ ১১৬ বছরের ইতিহাস সাক্ষী, হযরত মির্য গোলাম আহমদ (আঃ) ও তাঁর খেলাফত পৃথিবীতে দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে। বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে এটা কী জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়?

হযরত (আঃ) বলেছেন :

“আমাকে অস্বীকার করলে আমাকে নয় বরং আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ) এর অস্বীকার করা হবে। যে আমাকে অস্বীকার করে সে আমাকে অস্বীকার করার পূর্বে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।”

আল্লাহ্ তাআলা যাকে নিজ ওহী ও ইলহাম দিয়ে সম্মানিত করেন পৃথিবীর কেউ তাকে অপমান করতে পারে না। যারা আল্লাহ্র প্রোরিত মহাপুরুষকে অস্বীকার করে অপমান করতে চায় তারা তাদের নিজেদের ইহকাল পরকার সব ধ্বংস করে দেয়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে যারা আল্লাহ্র প্রেরিত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) মান্য করেছেন তারা রূহানী জীবন লাভ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আর জীবন্ত খোদার অস্তিত্বে সন্ধান পেয়েছেন। আল্লাহ্র নূর লাভ করেছেন, নিদর্শন দেখেছেন। খুব কম আহমদী আছে যারা এখনও আল্লাহ্র নিদর্শন দেখে নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবাগণ খলীফাগণ আল্লাহ্র বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। খলীফাগণ প্রকাশ্যে বলেছেন যে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলেছেন। তাদের দোয়া কবুল হয়েছে। প্রায় সকল আহমদী সাক্ষী দিতে পারবে যে তারা তাদের দোয়া কবুলের নিদর্শন দেখেছেন। কুরআনে এ কথাই বলা আছে যে, আল্লাহ্র তাঁর বান্দাদের দোয়া কবুল করেন।

যারা খোদাকে ভালবাসেন, খোদাকে ভয় করেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসেন. তারা আহমদীয়া জামাতকে ভালবাসেন এবং এর জন্য যে কোন প্রকার কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। যারা নিজ ঈমানের খাতিরে আহমদীয়াতের খাতিরে কুরবানী করেন তারা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখেন। আমাদের দেশেও এমন বহু আহমদী আছেন। আমি দু’একটি উদহারণ না দিয়ে পারছি না। সুন্দরবন জামাতের মসজিদের উপর এবং তাদের বাড়ী ঘরের উপর আক্রমণ হয়েছিল গত বছর। জামাতের আমীর সরদার আব্দুল মজিদের বাড়ীতেও আক্রমণ হয়েছিল। সেখানে কোন পুরুষও ছিল না, কেবল মহিলারা ছিলেন। মৌলভী ‘সাহেবরা ঐ বাড়ীতে আক্রমণ করলে সে বাড়ীর পুত্র বধু সেলী একাই লাঠি হাতে প্রধান গেটে দাঁড়িয়ে মৌলভীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অনেকক্ষণ চেষ্টা করছিল। মৌলভীরা মোটেই লজ্জাবোধ করেনি। এতে তার হাত ফেটে যায় এবং একটি আঙ্গুল নষ্ট হয়ে যায়। ঢাকায় তার সাথে আমি দেখা করি। শেলী বলল খালু দোয়া করেন, “আমি যেন আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে থাকি।” চিন্তা করে দেখুন। এ মেয়ে জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখেছে বলেই তো এখন তার আগ্রহ বেড়ে গেছে আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার।

ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মরহুম রফিক চৌধুরীর বাড়ীতে রাতে কেউ বোমা রেখে যায়। সকালে তার স্ত্রী, আমাদের বোন হোসনেয়ারা বেগম অচেনা জিনিস দেখে কৌতুহল বশত: সেটা হাতে নিলে তার হাতেই ঐ বোমা ফেটে যায়–তার হাত কব্জিসহ উড়ে যায়। আমাদের এই বোন হোসনেয়ারা বেগমের সাক্ষাৎকার আমি এম টি-এতে দেখেছি তিনি বললেন আমি তো ভালই আছি কেবল একটা হাতই না উড়ে গেছে, বাকী সব ঠিক আছে। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন (যারা বোমা রেখে ছিল)। তাদের হেদায়াত দিন।”

যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতে শামিল হন তারা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখেন, তারা তাদের ঈমানের মধ্যে এক অদ্ভুত ঐশী সতেজতা উপলব্ধি করেন। যে সব আহমদীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন তারা বলবেন যে, তারা জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। আমি স্বয়ং অনেক অনেক আহমদীদেরকে চিনি ও জানি যারা জীবন্ত খোদার নিদর্শন দেখেছেন। আমি নিজেও দেখেছি। আপনারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেই দেখুন আপনারা পবিত্র অন্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের নিয়্যতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেই দেখুন–আমি নিশ্চিত আপনারা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখবেন। আপনাদের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ্ ।

সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবী সত্য তিনি জীবন্ত খোদার প্রমাণ। যারা তাকে মান্য করছে তারাও আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করেছেন, এবং নিদর্শন দেখেছেন। আজ আহমদীদের আসল সম্বল ও সম্পদ খোদার ভালবাসা। এটা জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে কেউ দেখতে পারে।

দেখুন চিন্তা করে। আল্লাহ্র প্রতি কত বড় ঈমান হলে মানুষ এমন বলতে পারে যার। একটা হাত উড়ে যে গেছে। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন আমার তো কিছু হয়নি।”

১৯৯৯ সনে খুলনা মসজিদে বোমা হামলা হয়েছে। সাতজন শহীদ হয়ে গেছেন। তারা দেখেছেন তারা জানেন যে, শাহাদত বরণের পূর্বে তারা কোন বিলাপ করেনি। প্রলাপ বকে নি। সুন্দর কথা বলতে বলতে চলে গেছেন। যারা আহত হয়েছেন তাদের দেখুন। কেউ তো দুঃখ করে না– যে, কেন এম হলো! আমি কেন পঙ্গু হলাম সবাই আল্লাহ্র ভালবাসার কথা বলে আল্লাহ্র নিদর্শনের কথা বলে। কেউ বলে না ‘আমার ভাগ্য খারাপ আমি কেন আহত হয়েছি। বরং সবাই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কুরবানীর সুযোগ দিয়েছেন।

আমার এখনও মনে পড়ে, শহীদ মুহিবুল্লাহ্র বাবা মরহুম মতিউর রহমান সাহেবের চেহারা মনে পড়ে। গভীর রাতে খুলনা হাসপাতালে আমাদেরকে আহত দেখে বললেন, আমার মহীবুল্লাহ্ শহীদ হয়েছে আমার আফসোস নাই আপনি আমাদের মুরুব্বী আল্লাহ্ যেন আপনাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখুন, আমরা দোয়া করছি।’ খুলনা বা সুন্দরবনের ঐ

লোকগুলোর ঈমান কি রকম! যারা সবাই মুরুব্বীর জন্য দোয়া করছিলেন অথচ তাদের নিজেদের সাতজন শহীদ হয়েছেন, মাত্র কয়েকঘন্টা পূর্বে। তারা জামাতকে কত ভালবাসে, তারা হযরত মসীহ্ মাওউদকে কত ভালবাসে যে ও রকম বলতে পারে?

সুতরাং আমি শুধু আহমদী ভাইদের বলছি না, সকল দেশবাসীকে বলছি I am calling all of my country fellow-come towards Ahmadiyyat

আমি আমার দেশবাসীকে ডাকছি, আপনাদের সকলকে ডাকছি. আপনারা আমাদের জামাতের খোঁজ খবর করুন, অনুসন্ধান করুন, এখানে জীবন্ত খোদার সন্ধান পাবেন আল্লাহ্র নূর দেখবেন, যেমন আমরা দেখেছি।

অবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর লেখা হতে পড়ে শোনাব এবং আমার বক্তৃতা শেষ হবে। হুযূর (আঃ) লিখেছেন:

"আমার উপর এমন রাত খুব কম অতিবাহিত হয় যখন আমাকে এ সান্তনা দেয়া হয় না যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং আমার আসমানী সৈন্য বাহিনী তোমার সাথে আছে। যদিও পবিত্র হৃদয়ের মানুষ মৃত্যুর পরে খোদাকে দেখবে, কিন্তু আমি তাঁরই মুখের কসম খেয়ে বলছি, আমি এখনও তাঁকে দেখছি। দুনিয়া আমাকে চিনেনা, কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এটা এসব লোকদের ভুল, এবং তাদের সুস্পষ্ট দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস চায়। আমি এমন বৃক্ষ যা প্রকৃত প্রভুর হাতের লাগানো বৃক্ষ যে, আমাকে কাটতে চায় এর ফল ইহা ব্যতীত আর কিছু না যে সে কারূন, ইহুদা ইসক্রিয়ুতী এবং আবু জাহলের ভাগ্যে যা হয়েছে তা থেকে কিছু অংশ সে পেতে চায়।................হে মানবমন্ডলী! তোমরা নিশ্চিত জানিও যে, আমার সাথে ঐ হাত আছে, যে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে।

যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের স্ত্রীলোকেরা, তোমাদের যুবক, তোমাদের বৃদ্ধরা তোমাদের ছোট, তোমাদের বড়রা সবাই সম্মিলিতভাবে আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া করতে থাক, এতবেশী যে, সেজদা করতে করতে নাক গলে যায় এবং হাত অবশ হয়ে যায়, তবুও খোদা তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন না। এবং তিনি তাঁর কাজ শেষ না করে ক্ষান্ত হবেন না। মানুষ জনের কেউ একজনও যদি আমার সঙ্গী না হয় তাহলে খোদার ফেরেস্তারা আমার সঙ্গে থাকবেন। এবং তোমরা যদি সাক্ষী গোপন কর, তা'হল খুব সম্ভব পাথর আমার জন্য সাক্ষী দিবে। অতএব, তোমরা নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম (অবিচার) কর না। মিথ্যাবাদী মুখ ভিন্ন হয়, সত্যবাদীদের মুখ ভিন্ন হয়। খোদা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দিয়ে ছেড়ে দেন না। আমি ঐ জীবনের প্রতি অভিশাপ দেই যার মধ্যে মিথ্যা এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচিত হয়। আরো এই যে, মানুষের ভয়ে খোদার আদেশ পালনে বিরত থাকা হয়। ঐ সেবা কর্ম যা যথা সময়ে মহাশক্তিশালী খোদা আমার উপর ন্যাস্ত করেছেন এবং ঐ কাজের জন্যই আমাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এটা কখনই সম্ভব না যে, আমি ঐ কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করব। (এ কারণে) যদি সূর্য একদিকে থেকে এবং অপর দিক থেকে পৃথিবী এসে পরস্পর মিলিত হয়ে আমাকে নিষ্পেসিত করতে চায় (তবুও)।

মানুষ কি জিনিস? কেবল একটি কীট মাত্র, মানুষ কী জিনিষ? কেবল এক টুকরা মাংস পিন্ড মাত্র। সুতরাং একটুকরা মাংস পিন্ডের খাতিরে আমি কি করে হাইও কাইয়ূম খোদার আদেশকে অমান্য করতে পারি?

অতীতে যেমন খোদা তাঁর নিজ মামুরগণের মধ্যে এবং তাদের বিরোধীদের ও মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যখ্যানকারীদের মধ্যে একদিন ফয়সালা (বিচার করে) করে দিয়েছেন–ঠিক তেমনভাবে আজও তিনি তা করবেন। খোদার প্রত্যাদিষ্টদের আবির্ভাবের জন্যও একটি মৌসুম থাকে, আবার তাদের (আল্লাহ্র কাছে) প্রত্যাবর্তনের জন্যও একটি মৌসুম থাকে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখ যে, না আমি অসময়ে এসেছি, আর না অসময়ে ফেরত যাব। খোদার সাথে তোমরা লড়াই কর না– এটা তোমাদের কাজ না যে, তোমরা আমাকে ধ্বংস করবে।" (তোহ্ফায়ে গোলড়বীয়া, পৃঃ ৭-৮)

চিন্তা করে দেখুন, জীবন্ত খোদার সমর্থন ছাড়া কে এমন করে বলতে পারে?

আল্লাহ্ বলেছেন :

আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, আমি ও আমার প্রেরিত নবী বা মা'মুরগণ অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন।' হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ও এ আয়াত উল্লেখ করে আল ওসীয়্যত পুস্তকে লিখেছেন যে, তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন। (সূরা মুজাদেলা ঃ ৫৮ : ২২) সারা পৃথিবীর মানুষ এক ধর্ম ইসলাম ও এক মুসলিম জাতিতে পরিণত হবে, সকলের ইমাম হবেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), সবার কলেমা এক কলেমা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ।" জীবন্ত খোদার সিদ্ধান্ত ব্যতীত আজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের বিজয়ের জন্য এ কর্মকান্ড সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্ সকলকে এ সত্য উপলব্ধি করার সৌভাগ্যদান কর। ওয়া আখেরো দাওয়ানা আনেল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৩তম সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

মুরব্বী সিলসিলা

ইমাম মাহদী (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

“হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মোবাহালায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আমেরিকা নিবাসী মসীহ্ দাবীকারক আলেজান্ডার ডুইর শহর ‘যিয়ন’-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট–

আমেরিকায় আলেকজান্ডার ডুইর নিবাস ও তার শহর সফর করে এসে চৌধুরী আব্দুর রশিদ আর্কিটেক্ট, লন্ডন বর্ণনা করেন ঃ

২০০৩ সালে এক বিবাহ উপলক্ষ্যে আমার সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ডুই সাহেবের শহরের নাম “যিয়ন”। সিকাগো থেকে যিয়ন যেতে প্রায় ১ঘন্টা সময় লাগে। ডুই সাহেবের বাড়ী যাওয়ার পথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মিশন হাউজের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি কিন্তু সেখানে অপেক্ষা না করেই শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ভাবলাম ‘যিয়ন’ দেখা শেষ হলে এখানে এসে যোহরের নামায আদায় করব আর এর ফলে অন্যান্য আহমদীদের সাথেও দেখা হয়ে যাবে। আমি ডুই সাহেবের ঘর ও আশ পাশের এলাকায় প্রায় এক ঘন্টা ঘুরেফিরে দেখলাম। যোহরের সময় মিশন হাউজে ফেরত আসলাম। নামায শেষে মুরব্বী সাহেব মেহমানদারী করলেন এজন্য তার শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি ভেবে দেখলাম আলেকজান্ডার ডুই সাহেব, তার আবাস ও তার শহর সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার–তাই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

* স্কটল্যান্ডের Edinburgh-এ ১৮৪৭ সালে ডাঃ ডুই সাহেবের জন্ম। তার বয়স যখন ১৩ বছর তখন তার বাবা তাকে সাথে করে অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য চলে আসে। কিন্তু ডুই সাহেব উচ্চ শিক্ষার জন্য পুনরায় ইংল্যান্ডে চলে আসে এবং Edinburgh University –তে এডমিশন নেয়। পড়া শেষে অষ্ট্রেলিয়া ফেরত আসে এবং ১০ বছর যাবৎ সেখানের এক পাদ্রীর অধীনে কাজ করে।

এরপর সে International Divine Healing Association বানায়। এরপর সে ঘোষণা দিল, “ঈসায়ী মসীহ্র কাফফারার প্রতি ঈমান আনার ফলে অসুস্থদেরকে সুস্থ করার শক্তি সৃষ্টি হয়। আর এ শক্তি-সামর্থ ও কারিশমা তাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছে।” এই দর্শনকে আরও অগ্রগামী করার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে সে অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসে। দুই বৎসর পর্যন্ত পশ্চিম তীরবর্তী এলাকায় তার তবলীগ অব্যাহত রাখে এবং অবশেষে ১৮৯০ সালে সিকাগোতে অবস্থান পাকা করে। প্রথম দিকে চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে সে তার বক্তব্য প্রদান করতো। তার বক্তব্য শুনতে কেউ আগ্রহ দেখাতো না। ৬ বছরের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে কিছু লোক তার কথায় আকৃষ্ট হতে শুরু করে। সেই লক্ষ্যে অক্টোবর ১৮৯৫ থেকে শুরু করে এপ্রিল ১৮৯৬ পর্যন্ত একটি বড় হল ক্রয় করে নেয় এবং এর ভেতরে তার কার্যক্রম চালাতে থাকে এবং সেখানেই সে যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। এই সফলতার পরিণাম স্বরূপ ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬ সালে খৃষ্টান ক্যাথলিক চার্চ নামে এক নতুন ফিরকার ভিত্তি স্থাপন করে। ডাঃ ডুই এক ভাল বক্তা, দীর্ঘ দেহ, চমৎকার আকর্ষণ ক্ষমতা থাকার কারণে অল্প দিনেই তার এ ফিরকায় অসংখ্য লোক দীক্ষা গ্রহণ করে। ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তাদের জন্য একটি নতুন শহর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন যা পরবর্তীতে ‘কেনাম’ শহর নামে প্রসিদ্ধ হয়।

‘যিয়ন’ শহর ঃ ডাঃ জন আলেকজান্ডার ডুই তার আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং নিজ মুরিদগণকে এক স্থানে একত্রিত করার জন্য জুলাই ১৯০০ সালে এ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার ধারণা ছিল, এ শহরে তার ২ লাখ মুরিদ বসবাস করতে পারবে। সেভাবেই এ শহরের ডিজাইন করা হয় যেন এটি একটি ভিন্ন আঙ্গীকের এবং দৃষ্টান্তমূলক শহরে পরিণত হয়। এর রাস্তা-ঘাট প্রশস্ত রাখা হয়। মেধা বিকাশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মাঝে মাঝে Opean Areas রাখা হয়। শহরের জন্য সে ৬০০ একর জমি ক্রয় করে যার পুরোটাই মুরিদদের কাছ থেকে ধার করা। পরবর্তীতে এসকল মুরীদদেরকে সে সস্তায় শহরের পজেশন বিক্রি করে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরী, স্কুল, কলেজ, দফতর, মার্কেট এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের ১০ শতাংশ সে তার চার্চের জন্য গ্রহণ করতো। নিঃসন্দেহে শহর ভাল উন্নতি করছিল এবং দূর-দূর থেকে তার ভক্তরা এ শহরে বসবাসের উদ্দেশ্যে নিজেদের ভিটা-মাটি বিক্রি করে আসতে থাকলো। ডাঃ ডুই সাহেব এ শহরের ওলি-গলিগুলোর নাম বাইবেল থেকে নির্ধারণ করেছিল। এভাবে এ শহর একটি ধর্মীয় শহর স্বরূপ Develop করল এবং লোকেরা এটাকে চার্চের শহর বলতে শুরু করল। যদিও প্রথম দিকে এটি পূর্ণ মাত্রায় Development করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পূর্ণ Target-এ পৌঁছতে পারেনি।

এ শহরের বিস্তৃতি, সৌন্দর্য এবং অতি চমৎকার বিল্ডিংগুলোর কারণে অল্পদিনেই “যিয়ন” আমেরিকার বিখ্যাত শহরগুলোর একটিতে পরিণত হল। এর নিজস্ব সংবাদ পত্র “নিউজ অফ হিলিং” অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল যার ফলশ্রুতিতে ডুই সাহেবের মুরিদ লাখে গিয়ে পৌঁছলো।

জন আলেকজন্ডার ডুইর আবাস ভবন ঃ আলেক জান্ডার ডুই-এর বসবাসের জন্য ১৯০১ সালে “যিয়ন” শহরে একটি বাড়ী নির্মাণ করা হয়। এটি ছিল ২৫টি কক্ষ সম্বলিত তৃতল ভবন। সে সময় এটি নির্মাণে ৯০ হাজার ডলার (৫৪ লাখ রূপি) খরচ হয়েছিল যা আজ-কালকার হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫০ কোটি টাকার কম হবে না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে লোকজনের সাথে সাক্ষাৎকল্পে কয়েকটি কক্ষ রাখা হয়। দোতলায় থাকার ঘর ও লাইব্রেরী এবং তৃতীয়তলায় নিরাপত্তা প্রহরী এবং মেহমানদের জন্য কক্ষ নির্ধারিত ছিল। ওঠা নামার জন্য দুটি শিড়ি যার একটি ডুই সাহেব ব্যবহার করতো এবং অন্যটি বাকীরা উঠা নামায় ব্যবহার করতো। বাড়ীটির ডিজাইন Architecturily খুবই সুন্দর। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি কোন ধর্মসেবকের বাড়ী বলে মনে হয় না।

গোসলখানা তৈরীর সরঞ্জামাদি ইউরোপ থেকে আনা হয়েছিল। ডাইনিং রুমে একটি বড় টেবিল যার চার পাশে ১৬টি চেয়ার রাখা

হয়েছে। বই-পুস্তক রাখার জন্য যে আলমারিটি রয়েছে তা সে সময় ৫০ হাজার ডলার খরচ করে তৈরী করা হয়। খাবারের পাত্র রাখার জন্য ১৬ ফিট উচ্চতার আলমারী রয়েছে। চতুর্দিকে ডুই সাহেব এবং তার পরিবার বর্গের ছবি আজও লাগানো রয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় ৯ই মার্চ ১৯০৭ সালে জন আলেকজান্ডার ডুই সাহেবের মৃত্যু হয়। সে সময় তার বংশধরেরা কেউ-ই সে ঘরে উপস্থিত ছিলনা। বাড়ী থেকে ৫ কি মিঃ পায়ে হাটার পথ অতিক্রম করে এক সাধারণ কবরস্থানে ডুই সাহেবের সমাধি। তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথরের ফলকে ডুই সাহেবের নাম লেখা রয়েছে। পাথরের ফলকটি পরিচর্যার অভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে।

* ডুই সাহেবের মৃত্যুর পর বাড়িটিতে তার কয়েকজন মুরিদ বসবাস শুরু করে কিন্তু তারা বেশী দিন এর খরচ যোগাতে সক্ষম না হওয়ায় বাড়িটি বিক্রয়ের ঘোষণা দিতে হয়। Philadelphia-র এক ধনী মহিলা ১৯১০ সালে বসবাসের জন্য বাড়িটি ক্রয় করে। এ মহিলা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সেখানে বসবাস করে এবং তার মৃত্যুর পর বাড়ীটি পুনরায় বিক্রির ঘোষণা দেয়া হয়। জন আলেকজান্ডার ডুইর কয়েকজন ভক্ত এক Great Lakes Bible Institute বানালো এবং বাড়ীটি ক্রয় করে স্কুল চালাতে থাকলো। স্কুলটি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চলার পর পুনরায় তা বিক্রয়ের ঘোষণা হল। এবার বাড়িটি দুজন ধনী ব্যক্তি Mr. D.C Hunty এবং Mrs. Hunty সম্মিলিতভাবে নিজেদের বসবাসের জন্য ক্রয় করলো। Mr. Hunty -র বাড়ীর দেখাশুনা করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। ফলে তিনি বাড়িটি বিক্রয়ের জন্য বাজারে ঘোষণা দিলেন সেখানের একটি Real Estate Agency-র মালিক Mr. Wesly Ashl কে Mrs. Hunty- বাড়ীটি ক্রয় করতে বল্লো যেন সে বাড়িটি ঐতিহাসিক বিল্ডিং হিসেবে হেফাজত করে। Mr Ashlan একটি Zion Historical Society বানালো এবং নিজে এর সভাপতি হয়ে Mrs. Hunty-র কাছ থেকে বাড়ীটি ১৮৫০০ ডলারে ক্রয় করলো। ততদিনে বাড়ীর অবস্থা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ। পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্টও কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছে। এ বাড়িটিকে দীর্ঘ ৬০ বছর পর এই প্রথম কোন পরিচর্যার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো।

কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে ২০০২ সালে খাকসারের বাড়িটি দেখার সৌভাগ্য হয়। এখানে প্রবেশ করতে পাঁচ ডলারের একটি টিকিট ক্রয় করতে হয়। আজ এ বিরান বাড়ীটি দেখে সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম, নিজ ক্ষমতার আত্মম্ভরিতায় খোদার প্রকৃত বান্দার খোদার প্রিয় বান্দার সাথে অপলাপের কি পরিণাম হয়। আমরা তৃতীয় তলা দেখা শেষে যখন দ্বিতীয় তলায় আসলাম, দেখি এক ইংরেজ বৃদ্ধ ভদ্র লোক একটি শিশুর হাতে হাত দিয়ে হাটছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি জন আলেকজান্ডার ডুই সাহেবের মুরীদ। তিনি বল্লেন, না। আমি শহরটি দেখতে এসেছিলাম তাই ভাবলাম এ বাড়ীটিও দেখে যাই। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, যদি ডুই সাহেবের ব্যক্তিগত কক্ষগুলো দেখতে চান তাহলে দোতলা এবং তৃতীয় তলায় অবশ্যই যান। তিনি বল্লেন, অযথা ৫ ডলার খরচ করার কি দরকার? ইতিমধ্যে এক দল লোক দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম তারা সকলেই আহমদী।

মূল বক্তব্যে আসা যাক। এমনিভাবে ৬৩ সালের দিকে ঐ বাড়িটির দেখাশুনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তার অনেকাংশ আহমদীরাই বহন করেছে কেননা আহমদীরা বাড়ীটি দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করে।

এছাড়াও ডুই সাহেব যখন শেষ পর্যায়ে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে তার মুরীদরা যখন তাকে এ অবস্থায় ফেলে চলে যায় তখন আহমদীদের চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মানবতা বোধের কারণে আহমদীরা তার চিকিৎসা সেবা প্রদান করে এবং তার চিকিৎসার খরচ বহন করে।

ডাঃ জন আলেকজান্ডার ডুইর পরিণাম ঃ ডাঃ আলেকজান্ডার ডুই ১৯০০ সালের শুরুর দিকে দাবী করে "আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলব, তোমরা তা পুর্ণতা দেবে। কেননা আমি খোদার পয়গাম্বর"। ডাঃ ডুই আমাদের প্রিয় নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোর বিরোধী ছিল এবং সে সর্বদা চেষ্টা করতো ইসলামের দূর্ণাম ছড়াতে এবং পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিতে। সে অনুযায়ী সে তার পত্রিকায় লেখে,

"আমি আমেরিকা ও ইউরোপের খৃষ্টান জাতিকে সম্বোধন করে বলছি, ইসলাম মৃত নয়। ইসলাম শক্তিতে ভরপুর যদিও তা ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল। মুহাম্মদিজমকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। কিন্তু ইসলামের বরবাদী নাতো দূর্বল ক্ষীণ ল্যাটিন খৃষ্টানদের মাধ্যমে হবে না শক্তিহীন রোমীয় খৃষ্টানদের মাধ্যমে আর না ঐ ক্লান্ত-শ্রান্ত খৃষ্টানদের মাধ্যমে যারা ঈসা মসীহকে কেবল নামেমাত্র মান্য করে এবং না-তো ইসলাম ঐ সকল পেটুক লম্পট, বদমাশ, অকর্মণ্য এবং জালেম এর জীবন অতিবাহিত করছে তাদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (নিউজ অব হিলিং ২৫শে আগষ্ট ১৯০০ সাল)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"মোটকথা, ডুই বারবার বলছে অচিরেই এরা ধ্বংস হবে কেবল ঐ দলটি ব্যতিত যারা ঈসা মসীহকে খোদা বলে মান্য করে। এবং ডুই সাহেব আরও লেখে ইউরোপ, আমেরিকার সমস্ত খৃষ্টানদের উচিত যত দ্রুত সম্ভব ডুই-কে যেন তারা মান্য করে, ফলে তারা বরবাদি থেকে মুক্তি পাবে।

সে যেহেতু এ অযৌক্তিক দাবী করছে যে সে খোদার রসূল এটা মেনে নেয়া হোক। বাকী থাকলো মুসলমানরা। সুতরাং আমরা ডুই সাহেবকে বিনম্রভাবে জানাচ্ছি, এ মোকদ্দমায় হাজারও মুসলমান মরার কী দরকার। একটি সহজ পন্থা আছে যার দ্বারা প্রতীয়মান হতে পারে ডুই সাহেবের খোদা সত্য-খোদা নাকি আমাদের খোদা সত্য। তা হচ্ছে, ডুই সাহেব যেন বারবার এতসব মুসলমানদের মৃত্যুর খবর না দেয়। বরং কেবল আমাকে সামনে রেখে এ দোয়া করে, 'যে আমাদের মধ্য থেকে মিথ্যাবাদী সে যেন আগে মারা যায়'।"

যখন ডুই সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ পত্রের উত্তর না দিলো, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০৩ সালে অপর একটি পত্রের মাধ্যমে উক্ত চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করলেন। হুযুর (আইঃ) লেখেন, **"আমি প্রায় ৭০ বছরে পদার্পণ করেছি এবং ডুই যেভাবে বর্ণনা করেছে সে অনুযায়ী সে ৫০ বছরের যুবক। কিন্তু আমি তার চেয়ে বয়স্ক হওয়া সত্তেও কোন চিন্তা করি না কেননা মোবাহালার পরিণাম বয়সের মাধ্যমে নয় বরং খোদা যিনি সর্বোত্তম বিচারক তিনি-ই এর বিচার করবেন। আর যদি ডুই এ মোকাবেলা থেকে পলায়ন করে তবুও তোমরা জেনে রাখো তার 'যিয়ন' শহরে অচিরেই দুর্ভোগ আসতে যাচ্ছে।"** (চলবে)

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (পলাশ)
মুরব্বী সিলাসিলা

আমীর,
জামাত আহমদীয়া
বাংলাদেশ

প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ) লন্ডনে অবস্থিত বায়তুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) তাঁর খুতবায় আল্লাহ্ তাআলার "রহমান" সিফত বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি আল্লাহ্ তাআলার "রহমান" গুণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ব্যক্তিত্বে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি কিরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পোষণ করতেন তার উপর আলোচনা করেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করতেন। তিনি (আঃ) তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের স্বপক্ষে রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাই এক দুরূহ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একই সাথে মানবজাতির জন্য তাঁর হৃদয়ে সর্বপ্রকার দয়া ও সমবেদনা প্রবল ছিল। তাঁর জীবনের এই দিকটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত। কারণ তিনি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য শোকর গুযার হতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আমি তোমার জন্য নিজ হাতে আমার করুণা ও শক্তির বৃক্ষ রোপন করেছি।"

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর সহজাত দয়া ও সমবেদনা শুধু আধ্যাত্মিকভাবে ব্যধিগ্রস্থদের জন্য নয় বরং শারীরিক ভাবে রুগ্নদের জন্যও তাঁর (আঃ) হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। তিনি দোয়ার মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনও পূরণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রুগ্নদের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন তার কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর হৃদয় খোদার সৃষ্টির জন্য ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। তিনি (আঃ) কখনও কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। বরং তাদের প্রয়োজনগুলোর খোঁজ খবর নিজেই নিতেন এবং সে সব প্রয়োজন মেটাতেন। একবার তিনি (আঃ) তাঁর এক নিষ্ঠাবান অনুসারীকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন এ কথা বলে যে, শীতের সময় তার শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি যা কিছুই মানুষকে দিতেন, লোক দেখানোর জন্য দিতেন না। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর সৃষ্টির সাহায্যের জন্য দিতেন। তিনি শত্রু-মিত্র এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রয়োজন মেটাতেন। কখনও কখনও তিনি প্রকাশ্যেও দান করতেন অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শিশুদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। শিশুদের মারধর করা বা তিরস্কার করার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শিশুদের দুষ্টামির জন্য কখনও রাগ করতেন না।

হুযূর (আইঃ) আমাদের ডাক্তারগণের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ বিশেষ করে যারা তাদের জীবন ওয়াক্‌ফ করেছেন, এ বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। রোগীদের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং শিষ্টাচারের সাথে তাদের চিকিৎসা করতে হবে। কারণ এর ফলেই অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে যায়। এদিকটিতে অনেক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আহমদী কৃষকগণ, বিশেষ করে সিন্ধু প্রদেশের থর এলাকার কৃষকদের তাদের এলাকার শ্রমিকদের পূর্ণ মজুরী দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ সামর্থানুযায়ী তাদের সেবা করতে হবে। ঐ এলাকাগুলোতে এটিই দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কার্যকর উপায়।

হুযূর (আইঃ) প্রাণী ও পাখীদের প্রতি মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দয়ার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "দয়ামায়া শূন্য হৃদয় ঈমানহীন হয়ে থাকে।" প্রাণীকূলের প্রতি নির্দয় আচরণ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একদা একটা কুকুর বাড়ীতে ঢুকে পড়লে শিশুরা কুকুরটিকে একটি ঘরে আটকে রেখে মারতে চেয়েছিল। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি খুব রাগ করলেন এবং কুকুরটিকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন দোয়া করতেন তখন এমন ব্যাথা-বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে দোয়া করতেন যে, তা শ্রবণকারীর হৃদয় বিগলিত করে দিত। তাঁর কাকুতি-মিনতি ভরা দোয়া মনে হতো একজন মহিলার প্রসব বেদনার মতো।

এভাবে তিনি (আঃ) মানবজাতির জন্য দোয়া করতেন। হযরত মৌলভী আব্দুল করিম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মসীহ্ মাওউদকে (আঃ) এরূপ অবস্থায়ই দোয়া করতে দেখেছিলেন। তিনি (আঃ) সকাতরে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করছিলেন যে, যদি এ লোকগুলো প্লেগ রোগে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাঁর (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করার জন্য আর কারা অবশিষ্ট থাকবে? সংক্ষেপে বলা যায় যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মানুষের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত আকাংখিত ছিলেন এবং মানবজাতির জন্য তার সহানুভূতির কোন তুলনা খোঁজে পাওয়া যায় না।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ সকল আহমদীর কর্তব্য হলো নিজেদের দোয়ার মধ্যে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দোয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা, তাঁর শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে অবলম্বন করা এবং সহানুভূতি ও ভালবাসার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে এ শিক্ষাগুলোর বিস্তার দান করা দোয়ার মধ্যে যতটা বেশী সম্ভব সময় দিন। চলুন আমরা এ শ্লোগান তুলি, "আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।" এবং যে উদ্দেশ্যে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সে মহাসুসংবাদ সম্প্রচারে যোগদান করি।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে অনুরূপ কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

অনুগ্রহপূর্বক হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত এ নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিন।

জাযাকুমুল্লাহ।

ওয়াস্সালাম

চৌধুরী হামীদুল্লাহ্
উকিল আ'লা
তাহরীক জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান

তারিখঃ ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ইং

অনুবাদক ঃ **বশীর উদ্দীন আহমদ**

সুরভীত এক ফুল মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)

সব ঋতুতে সব ফুল ফুটে না। অধিক ফল ধরে না। আবার সব স্থানে ফুল ও ফল পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে না। কালের চক্রে ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতি যখন অপরূপ মোহনীয় হয়ে উঠে, তখনই স্থানভেদে অধিক সংখ্যক বিভিন্ন ফুল ফুটে ও ফল ধরে এবং ফুল ও ফলের মহাসমারোহ দেখা যায়। প্রকৃতি শ্যামল সজীবতায় নতুন স্পন্দনে মেতে উঠে। ফুল ও ফলের সৌরভে মানুষ বিমোহিত হয়। প্রাণে দোলা লাগে। অনাবিল আনন্দঘন প্রশান্তি পাওয়া যায়। অনুরূপ মানবের রূহানীয়তের বাগান যখন শুষ্ক, নির্জীব ও কলুষিত হয়ে উঠে তখন খোদার নূর বিশেষ বিকশিত হয় না। তাই মানব প্রেমিক আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অমোঘ বিধানে কালের চাহিদার প্রেক্ষাপটে মানবের রূহানীয়তের বাগান শ্যামল সজীবতায় নতুন স্পন্দনে জাগ্রত ও মোহীত করে গড়ে তোলার জন্য যুগে যুগে তাঁর বনমালী নবী রসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা ঐশী প্রেরণায় শিক্ষা ও প্রজ্ঞা লাভে মানব হৃদয়ে রূহানীয়তের বাগান মহাসমারোহে সৃষ্টি করেন। ফলে অধিক ফুল ফুটে ফল ধরে। বীজ থেকে নতুন নতুন গাছ জন্মায়। বাগান ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়। সৌরভীত হয়ে উঠে রূহানীয়তের বাগান। আবির্ভূত মহাপুরুষের মিশন সার্থক ও সফল হয়। চারদিকে বাজে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জয়ধ্বনী। উড়ে জয় নিশান।

চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্ তাআলার এ চিরন্তন বিধানে কালের চক্রে বর্তমান শেষ যুগে তাঁর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সারা বিশ্ব মানব হৃদয়ের মাঝে রূহানীয়তের বাগান সৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি অবক্ষয়ে নিমজ্জিত, নির্জীব কলুষিত মানব হৃদয়ের মাঝে নূরের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে রূহানীয়তের বাগান সৃষ্টির জন্য বীজ বপন করেছেন। ফলে সারা বিশ্বে তাঁর ফুল ফুটছে, ফল ধরছে, মহামহীরূপে বাগান সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে বলেন–তোমাকে ঐ সকল লোকে সাহায্য করবে যাদের প্রতি আমি আকাশ হতে ওহী নাযেল করবো (ইলহাম)। শতবর্ষ আগে বাংলার মাটিতে মহাসমারোহে ফুটে উঠা এমনি একটি অতুলনীয় ফুলের নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রঃ)।

এ মহান ব্যক্তি বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার অন্তর্গত নাসিরপুর গ্রামে প্রখ্যাত পীর বংশোদ্ভুত সাধক পরিবারে ৩০ জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আল্লামা আলহাজ্জ সৈয়দ আব্দুল গফ্‌ফার ওরফে হাজী জোয়াদ উল্লাহ্ ধর্মীয় জ্ঞানে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা পীর ও মুত্তাকী বলে মশহুর ছিলেন। তা থেকেই আল্লামা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার তরফ পরগনার সুলতানশী গ্রামে তএত্য জমিদার সৈয়দ আম্বর আলীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এ পক্ষেই আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মাতুলালয়ে জন্ম হয়। হাজী জোয়াদ উল্লাহ্ ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর শিষ্য হযরত শাহ মোহাম্মদ ইসহাক মোহাদ্দেস দেহলভী মোহাযের মক্কী (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) এর তরিকাভুক্ত হন। তাঁর পূর্ব পুরুষ কুতুবুল আউলিয়া হযরত শাহ নাসিরউদ্দিন (রঃ) মদীনা শরীফ থেকে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারে ভারতবর্ষে আসেন। শাহ নাসির উদ্দিন (রঃ) মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌরের বাদশাহ হোসেন শাহের পীর ছিলেন। হোসেন শাহ ১৪৮৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজত্ব করেন। উক্ত বাদশাহ আহ্বানে তার পীরের মদীনা শরীফ থেকে এদেশে আগমন হয়। বাদশাহ রাজা চরনারায়ণের অধীনস্থ মালদহ জেলার কলতানশাহী পরগণা তার পীরকে জায়গীর স্বরূপ দান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে চরনারাণের সাথে তাঁর বিরোধ হওয়ায় ৮১৭ হিজরী সালে তিনি বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার অন্তর্গত তরফ পরগনার বড়গাঁও নামক স্থানে হিজরত করেন। তাঁর মাজার মুরারবন্দ নামক স্থানে অবস্থিত। তরফে

শাহ নাসির উদ্দিনের পুত্র শাহ্ সিরাজ উদ্দিনের সাথে কাজী নূরুদ্দিনের কন্যার বিবাহ হয়। তাঁর দুটি ছেলের জন্ম হয়। একজন শাহ মোসাফের ও অপর জন শাহ ফকির। শাহ মোসাফেরের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ বায়েজিদ বড়গাঁও থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার নাসিরপুর গ্রামে হিজরত করেন। তারই অধঃস্তন পুরুষ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রঃ)।

তাঁর চৌদ্দ পুরুষের বংশক্রমধারা নিম্নরূপ ঃ–

১। শাহ নাসির উদ্দিন (হিজরত করে ভারতে আসেন)।
২। তদীয় পুত্র শাহ সিরাজুদ্দিন
৩। ” ” শাহ মোসাফের
৪। ” ” শাহ খোদাওন্দ
৫। ” ” শাহ মেকাইল
৬। ” ” সৈয়দ লুকমান
৭। ” ” সৈয়দ নূর
৮। ” ” সৈয়দ সুলতান (তিনি সুলতানশীতে হিজরত করেন)
৯। ” ” সৈয়দ বায়েজিদ (তিনি নাসিরপুরে হিজরত করেন)
১০। ” ” সৈয়দ লুৎফুল্লাহ
১১। ” ” সৈয়দ এনায়েতউল্লাহ
১২। ” ” সৈয়দ এবাদুল্লাহ্
১৩। ” ” সৈয়দ মুতি উল্লাহ্
১৪। ” ” আল্লামা সৈয়দ আব্দুল গফ্ফার ওরফে হাজী জোয়াদ উল্লাহ্
১৫। ” ” মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রঃ)।

ফলে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদের ধমনীতে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় ওলী ও মামুর ব্যক্তিদের রক্ত প্রবাহিত এবং সত্যকে অনুসন্ধানে খোদার প্রেমে বিভোর হওয়ার অনুপ্রেরণা জাগ্রত ছিল। তাই পীর বংশের সন্তান আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবকে তাঁর পিতা শৈশব থেকেই ধর্মীয় শিক্ষায় আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। অভিভাবকদের একান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল তাদের আদরের ছেলে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভে গদ্দীনিশী পীর হোক। নিজেদের বিষয় সম্পত্তির প্রতি মনোযোগী হোক এবং পীর বংশের ঐতিহ্যকে ধরে রাখুক। তাই পিতা তাকে বাড়ীতে আরবী ও ফার্সী ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনিও মনোযোগের সাথে জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও বিনয় ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে। তবে তিনি পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ধর্মীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হলেও পিরানীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহকে অপছন্দ করতেন। সমাজের আলেম ওলামাদের মধ্যে ধর্মীয় মত বিরোধ ও বিভিন্ন ফেরকা বাজীর কারণে সৃষ্ট ইসলামের দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত হতেন। ফলে প্রকৃত শিক্ষাকে আহরণে তাঁর মাঝে বাসনা জন্মে। উচ্চ শিক্ষিত আলেম হবার সাধ জাগে। তাই সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী বালক একদিন বাড়ীতে কাউকে না বলে ঢাকায় চলে আসেন। এবং ঢাকা সরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তখন একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কেউ জানতো না খোদার প্রেমে ঘর ছাড়া এ বালক একদিন অনেক বড় আলেম হবেন। যুগ ইমামের দীক্ষা গ্রহণে বঙ্গদেশে সর্ব প্রথম জামাত প্রতিষ্ঠাতায় ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। কালজয়ী মহান পুরুষ হবেন।

ঢাকা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি অত্যন্ত অধ্যবশায় মগ্ন হন। ফলে পরীক্ষায় প্রতিবারই প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর মেধাবী মুখ অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষকদের স্নেহভাজন হয়ে উঠে। সহপাঠীদের সাথে তাঁর আন্তরিক সখ্যতা সৃষ্টি হয়। পিতার অমতে বাড়ী থেকে চলে আসায় পিতা কখনও তাঁর আর্থিক সহযোগিতা করেননি। তিনিও কখনও কারো নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা চাননি। এবং কিছু গ্রহণ করেননি। তাঁর মাঝে স্বাবলম্বী ও অনেক বড় হবার চেতনা সর্বদা বিদ্যমান ছিল। তখন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও মেধাবী ছাত্রের সুনাম ছড়িয়ে পরে। সে সুবাদেই ঢাকার নবাব বাড়ীতে লজিং মাষ্টারের জন্য তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। নবাব পরিবারের অনেকেরই ধর্মীয় গৃহ শিক্ষক ছিলেন তিনি। পরীক্ষার বৃত্তির অর্থ দিয়ে তিনি লেখাপড়া ব্যয় নির্বাহ করেন।

ঢাকা মাদ্রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতায় চলে যান এবং কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর একত্ববাদের শিক্ষার জ্ঞান পিপাসু আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ধর্মীয় শিক্ষায় আরও জ্ঞান আহরণে ব্যকুল হয়ে উঠেন। তাই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনটি উত্তম এবং পন্ডিত ব্যক্তিত্বের শিক্ষক বিদ্যমান তা অনুসন্ধানে লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গী মহলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা আব্দুল হাই (রাহেঃ) এর অধীনে তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর একনিষ্ঠতার সাথে অধ্যয়ন করেন। ফলে জ্ঞান গর্ব পান্ডিত্যের শিক্ষক গুরুর সান্নিধ্য থেকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় ইসলামী শাস্ত্রে একজন বাগ্মী মাওলানা ও বিশিষ্ট আলেম হন। মেধা, বুদ্ধিমত্তা, ধর্মীয় অনুরাগ, সততা ও চারিত্রিক

মাধুর্যের কারণে মাওলানা আব্দুল হাই (রাহঃ) এর স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। তখন হায়দারাবাদ নিজাম সরকারের শরীয়তের কার্যউল কুজ্জাত (প্রধান কাজী বা জজ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাই (রাহঃ) এর পিতা। এ পদটি রাষ্ট্রীয়ভাবে অতি সম্মানজনক। তখনকার দিনের মাসিক বেতন ৫০০/- টাকা। মর্যাদার দিক দিয়ে বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধান বিচারপতি সমতুল্য। আব্দুল হাই সাহেবের পিতার মৃত্যুজনিত কারণে এ পদে একজন যোগ্য ব্যক্তি দেয়ার জন্য নিজাম বাহাদুর মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবকে অনুরোধ জানান। হাই সাহেব তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবকে সর্বাধিক যোগ্য হিসাবে নির্বচিত করেন এবং তাঁকে এ পদে যোগদানের জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব স্বদেশের মাটি ও মানুষের টানে এবং হায়দারাবাদ গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল হওয়ার কারণে উক্ত চাকুরীতে যোগদানে অসম্মতি জানান। অতঃপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। তখন ঢাকা সরকারী মদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাকে মুদাররেসে দওমের পদে মনোনীত করেন। কিন্তু এ চাকুরীতেও তিনি যোগদান করেননি। মূলতঃ তিনি আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আপন ভুবনে চলে আসেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, অদৃশ্যের চাবিসমূহ তারই নিকট, তিনি ছাড়া তা কেউ জানেন না। (আল আনআম ঃ ৬০)।

ঐশী পরিকল্পনায় চালিত, আল্লাহ্র ওলী বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেম উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ধর্মশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রত্যাবর্তনের পর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেন এক সূর্য সন্তান মাতৃকুলে ফিরে এসেছে। কেননা তখন তাঁর সমতুল্য ধর্মীয় জ্ঞানের পান্ডিত্যের আলেম অবিভক্ত বাংলায় বিরল ছিল। সারা ভারতবর্ষে হাতে গোণা মাত্র ক'জন ছিলেন। তাই এ ধর্মগুরুর দর্শন ও দোয়া লাভে এবং তার পান্ডিত্য হতে জ্ঞান আহরণে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ছুটে আসেন। শহরের মুসলমান হিন্দু সকল ধর্মাবলম্বী তাঁর প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধাবনত হন। এবং এ শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞান ভান্ডারকে কাছে ধরে রাখতে তাকে নিজ গ্রামে না যেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বসবাসের অনুরোধ জানান। ফলে তিনি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মধ্যপাড়ায় জমি ক্রয় করে বসতবাড়ী নির্মাণ করেন এবং নিজ জ্ঞাতী এক ধর্মপ্রাণ মহিলাকে বিবাহ করে দাম্পত্ত জীবন গড়ে তোলেন।

মাওলানা সাহেব তখন ধর্মের সেবায় নিজকে বিলিয়ে দেন। ইসলামের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে জড়িত হন। এতদাঞ্চলের মুসলমান ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে নিজ বাড়ীর কিয়দংশে প্রতিষ্ঠা করেন এক যুগপদ আধুনিক মদ্রাসা। এ বিদ্যাপীট থেকে জ্ঞান তাপসের পরশে বহু পান্ডিত্যের আলেম বের হন। শহরের থানার পার্শ্বে পুকুর পাড়ে দশ/বার জন মুসল্লির নামায পড়ার জন্য নির্মিত ছোট মসজিদটি অনেক বর্ধিত ও সংস্কার করে এক বিরাট জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনিই হন এ মসজিদের ইমাম ও খতীব। সরকার তাঁকে ম্যারিজ রেজিষ্টারের কাজী ও মুফতি পদে নিয়োগ প্রদান করে। উপরন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইদগা ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতীর দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের সকল বড় বড় ধর্মীয় কর্মকান্ডের প্রাণপুরুষ, অগ্রপথিক ও পথিকৃত হন মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি ছিল। শহরের আনন্দ বাজারের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ বাবু, জগৎবাজারের প্রতিষ্ঠাতা জগৎবাবু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী মহাদেব পট্টীর প্রখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক মহাদেবসহ বিভিন্ন হিন্দু বিত্তশালী ব্যক্তিরা ছিলেন শহরের কর্ণধার। কিন্তু তাদের মাঝে মাওলানা ওয়াহেদ সাহেবের আবির্ভাব এবং শহরে বড় মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকান্ড বিস্তার লাভে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। তাঁর পান্ডিত্যের প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের পরশে সকলে শ্রদ্ধা করতেন। একজন ধর্মগুরু ঋষিকল্প পুরুষ হিসেবে সুপরিচিত হন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান বলে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাদের সংকট নিরসনে তার নিকট দোয়ার আরজ জানাতেন। ফলে তখন তাঁর মাধ্যমে হিন্দু অধ্যুষিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 'বড় মাওলানা' বলে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আঞ্চলিক ভাষায় 'বাওন বাইড়ার বড় মাওলানা' বলে তাঁর পরিচিতির বিস্তৃতি হয়। বিশ্বের আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চারিত্রিক মাধুর্যে এবং ব্যক্তিত্বের গুণাবলীতে মক্কাবাসীর নিকট যেমন-আল আমীন বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, অনুরূপ আদর্শের অনুপ্রেরণায় আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আপন মহিমায় বড় মাওলানা বলে খ্যাতিমান হন। তাছাড়া তাঁর আবাসনের স্থান মধ্যপাড়ার কিয়দংশকে সকলে শতস্ফূর্তভাবে নামকরণ করেন 'মৌলভী পাড়া'। এ মৌলভী পাড়ার বড় মাওলানার কথা শতবর্ষ ধরে আজও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে কিংবদন্তী হয়ে আছে। (চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

পর্দা ঃ নারীর মর্যাদার প্রতীক

“ ইয়া আইয়ুহান্নবীউ কুললি আজওয়াযিকা, ওয়া বানাতিকা, ওয়া নিসা ইল মু’মুনিনা ইয়ুদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবিবিহিন্ন। যালিকা আদনা আইয়ুরাফনা ফালা ইয়ুযায়ীন। ওয়া কানাল্লাহু গাফুরুর রাহীম’’ (সূরা আহবাব, ৬০ আয়াত)

অর্থাৎ- “ হে নবী! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মোমেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া মুখমন্ডল পর্যন্ত) ঝুলাইয়া লয়। এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। বস্তুত: আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।’’

“পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক।’’ বিষয়টি নি:সন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ মোলা-মেশা সমাজে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে কিভাবে ভোগ্য পন্যের বস্তুতে পরিনত করেছে তা আমরা আমাদের চারিদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, দাম্পত্য কলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সবকিছুর পেছনেই একটি প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা।

যদিও ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে না বুঝার কারণে কেউ কেউ একে পশ্চাদপদতা, সেকেলে, নারীকে শৃঙ্খলিত করণের পন্থা, উন্নয়নের অন্তরায় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মূলত এই ভুল বুঝাবুঝির জন্য মুসলিম বিশ্বের কতিপয় এলাকায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অপপ্রয়োগ আর পাশ্চাত্য গণ-মাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকাই দায়ী। পাশ্চাত্য গণ-মাধ্যমের এটা একটা নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শণ করা হয। আর তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এতদ অঞ্চলেও অনেকে পর্দা প্রথা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষন করে থাকেন। একজন খ্রীষ্টান ‘নান’ বা ধর্মজাযিকা যখন লম্বা গাউন আর মাথা ঢাকা পোশাক পরে থাকেন তখন তা আর পশ্চাদপদতা, উন্নয়নের অন্তরায় বা নারীকে শৃঙ্খলিত করনের প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না। বরং তা শ্রদ্ধা, ভগ্নি বা মাতৃত্বের প্রতীক রূপেই বিবেচিত হয়।

নারী পুরুষের পৃথকীকরনের যে নির্দেশ ইসলাম দেয়, তা কোন ভাবেই প্রাচীন অন্ধকার যুগের সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত নয়। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর চতুর্থ খলিফা, আমাদের প্রয়াত ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহঃ) বলেন, “বস্তুত: সমাজে নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশার প্রশ্নটা বা এর উল্টোটার সঙ্গে সমাজের অগ্রবিমূখতা বা পশ্চাদমুখিতার কোন সম্পর্ক নেই। গোটা ইতিহাসেই দেখা যায় যে, সমাজগুলো সামাজিক বা ধর্মীয় তরঙ্গ মালায় হয় তুঙ্গে উঠে অগ্রসর হয়েছে, নয়তো তার তলায় পড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।’’ (Islam’s Response To Contemporary Issues).

অতএব, ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা বা ক্ষেত্র বিশেষে নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ নারীকে শৃঙ্খলিত করার পরিবর্তে তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলাম নারীকে বিরূপ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বা পর্দাপ্রথা নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে আসুন আমরা দেখি যে, তথাকথিত প্রগতি, নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কি দান করেছে।

বর্তমান যুগে, বিশেষত: পাশ্চাত্য বিশ্বে নারীকে তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সাথে তাল-মিলিয়ে এবং অনেকক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা efficient বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে।কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্যি কি নারী লিঙ্গ বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে ? ‘কলঙ্কময় অতীতের’ নিগ্রহ ও দমন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? তথাকথিত নারী স্বাধীনতা কি নৈতিকতা সম্বৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? সত্যিই কি নারী প্রকৃত সামাজিক ন্যায় বিচার লাভে সমর্থ হয়েছে? আমরা যদি বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে ‘না’। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখিন। তাই এককালের ‘সেকেলে বা outdated family concept’ বা পারিবারিক প্রথা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। নারী নির্যাতন, শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাশক্তি, কুমারী মাতৃত্ব বা single mother, ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কেবল পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয় আজ আমাদের সমাজেও এসকল ব্যাধির ক্রমশঃ সংক্রমন ঘটছে। বাহ্যিক চাক-চিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ করতে পারলেই আমরা সেই অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো দেখতে পাই। প্রচলিত সাধারণ ধারনায় বিংশ শতাব্দি বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়

থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই সময়ে বিশ্বে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা পঁচিশ ভাগ। এ বিষয়ে এখানে কয়েকটি জরিপের উল্লেখ করা হলো ঃ-

(১) গর্ভপাত ঃ ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডে গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করার পর সেখানে কেবল রেজিষ্টার্ড গর্ভপাতের ঘটনাই বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ। এর মধ্যে মাত্র শতকরা একভাগ (১%) স্বাস্থ্যগত কারণে আর বাকী ৯৯%-ই অবৈধ গর্ভধারণের কারণে। ১৯৬৮ সালে যেখানে ২২,০০০ রেজিষ্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয় সেখানে ১৯৯১সালে একলক্ষ আশি হাজার আর ১৯৯৩সালে তা দাড়ায় আট লক্ষ উনিস হাজারে।এর মধ্যে পনের বছরের কম বয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন হাজার।

এতো গেল যুক্তরাজ্যের অবস্থা। এখন আসুন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সেখানকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। রেজিষ্টার্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে দশলক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয়।

The Alan Guttmachere Institute নামের একটি গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মতে প্রকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা উক্ত সংখ্যার তুলনায় ১০%-২০% বেশি। এক্ষেত্রে ক্যানাডার পরিস্থিতি কিছুটা 'ভাল' অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক। তবে জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের দিগুন । অর্থাৎ জাপানে প্রতি বছর প্রায় বিশলক্ষ রেজিষ্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে।

তথাকথিত সভ্যজগতে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'র জন্য বিগত ২৫ বছরে এক বিলিয়ন অর্থাৎ দশ কোটিরও অধিক ভ্রুনকে হত্যা করা হয়। উক্তসংখ্যা কেবল মাত্র রেজিষ্টার্ড পরিসংখ্যান থেকে নেয়া হয়েছে । প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ। 'বর্বরযুগে' কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হতো অর্থনৈতিক কারনে কিন্তু আজ তথাকথিত সভ্যজগতে ব্যভিচার, অবৈধ মিলন আর অনৈতিকতার চিহ্ন মুছে ফেলতে এইসব হত্যাকান্ড চালানো হয়েছে। এসবই হলো বের্পদা আর নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল।

২. ধর্ষন ঃ- ধর্ষনের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এবিষয়ে রিপোর্ট করেনা। ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় বাস্তবে তা অনেক বেশি। ব্রিটিশ পুলিশের মতে ১৯৮৪ সালে, এই এক বছরে বৃটেনে ২০,০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক নিগ্রহ এবং ১৫০০ (পনের শ) ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। The London Rape Crisis Center এর মতে বৃটেনে প্রতিবছর অন্তত: পাঁচ থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। ১৯৯৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২,০০০ হাজারে। উক্ত সংস্থার মতে " If we accept the highest figures, we may say that, on average, one rape accurse every hour in England"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ। এখানে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানীর সংখ্যার চাইতে চারগুণ, বৃটেনের চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে প্রায় বিশগুণ বেশি। সবচাইতে উদ্বেগ জনক এবং বাস্তবতা এই যে, ৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬% নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। National Council for Civil Liberties নামক সংস্থার মতে ৩৮% ক্ষেত্রে পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত ও নারী স্বাধীনতার দাবীদার দেশগুলোর অবস্থা।

৩। বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিবাহপূর্ব সহবাস এবং 'Living Together' এর প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ সালে জন্ম গ্রহণকারী বৃটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক-বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পক্ষে তাদের যুক্তিছিল যে, এর ফলে নর-নারী একে অপরকে ভালভাবে জানতে পারে এবং এরপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ডেই সর্বাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে একলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দাড়ায় একলক্ষ পয়ষট্টি হাজারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল সাতলক্ষ আট হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় এগার লক্ষ পচাত্তর হাজারে। পক্ষান্তরে বিবাহের হারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি।

৪। কুমারী মাতৃত্ব ও একক মাতৃত্ব ঃ পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিক "নারী স্বাধীনতার" আর এক অভিশাপ হলো কুমারী মাতৃত্ব। বৃটেনে এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে কুমারী মাতার সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দুই লক্ষ পনের হাজারে। ১৯৯২ সালে জন্মনেয়া শিশুদের ৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই অবিবাহিতা বা কুমারী মাতাদের মধ্যে আড়াই হাজারের বয়স ১৫ বছরের নীচে। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরদিকে, অবৈধভাবে জন্ম নেয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী মাতা বা একক মাতৃত্বের উপর। নারীর উপর কুমারী মাতৃত্বের এই দায়ভার পশ্চিমা বিশ্বে নারী নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ।

৫। মদ্যপান ও ধুমপান ঃ পশ্চিমা ধাঁচের নারী-পুরুষের সমানাধিকার নারী সমাজের মধ্যে অনেক মন্দ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে। একসময় মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল

পুরুষের বদঅভ্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু আজ নারীও তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। The Sunday Times- এর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারীরা ‘‘নির্ধারিত মাত্রার’’ চাইতে অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা ও পরিমাণ পুরুষের সমান সমান।

৬) বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফীতে ঃ- তথাকথিক নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনী সামগ্রী এবং পর্নোগ্রাফীতে। পন্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি অপরিহার্য্য বিষয়। সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়- ‘‘আমেরিকার মেয়েরা যৌন আবেদনকারী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে। তাদের সামনে যেসব পন্য ও ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান প্রচার মাধ্যমে মহিলা ও তরুনীদের যৌন ভোগ্য পন্য হিসাবে দেখানো হচ্ছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন (এ পি এ) টাস্ক ফোর্স অন দ্যা সেক্সুয়ালাইজেশন অব গার্লস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে একথা বলা হয়। রিপোর্টের প্রনেতারা বলেন, টিভি শো থেকে ম্যাগাজিন এবং মিউজিক ভিডিও থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত প্রতিটি প্রচার মাধ্যমেই এ চিত্রই দেখা যায়। .... প্রণেতাদের মতে, যৌনরূপদান তরুনী ও মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো পেটের গোলযোগ, আত্মসম্মান হানিবোধ এবং মনমরা ভাব। .... লিজ গুয়া নামের একজন মহিলা বলেন, তিনি তাঁর ৮ বছরের মেয়ে তানিয়ার উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো খুবই আটসাট, নয়তো খুবই খাটো। যৌন আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ ধরনের পোশাক তৈরী করা হচ্ছে। ‘‘(দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭)

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা জগতের ঘুনেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাস্তব চিত্র তার চাইতেও আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক চাক-চিক্য আর প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে তথাকথিত ‘আধুনিক’ বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ ধ্বস নেমেছে। নারী স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছেভোগের সামগ্রী হিসাবে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন নির্ধারনের সঠিক ও পূর্ণ অনুসরণ।

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা- আহযাবের যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি সেখানে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা নবী করিম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এবং মুমেনগণকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ যেন চাদর দ্বারা নিজেদের মুখমন্ডল ও শরীর ঢেকে রাখে। যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ এবং প্রশান্তি

অনেকে বলে থাকেন যে, প্রকৃত পর্দা হলো মনে। মন ঠিক থাকলে নাকি দেহের পর্দার প্রয়োজন হয় না। ইসলামও একথা স্বীকার করে যে, মনের পর্দা খুবই জরুরী, পবিত্র কোরআনও মনের পর্দার উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু মন তো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেহকে কেন্দ্র করেই মনের অস্তিত্ব। তাই সবার আগে প্রয়োজন দেহের পর্দা।

আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, অনেকে ইসলামের পর্দা ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবে না বুঝার কারণে একে নানা ভাবে সমালোচনা করে থাকেন। তারা মনে করেন যে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নারীদের উপরে একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যার ফলে , তারা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহন করতে পারেনা। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। পর্দাপ্রথা এবং নারী পুরুষের পৃথকীরণের ইসলামী ধারনাকে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে নারীদের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে ঐসব উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা- নূরের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘‘তুমি মুমেনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফাযত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন’’ (২৪:৩১)

‘‘এবং তুমি মুমেন নারী দিগকে বল, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা ওড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ভগ্নি পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেণীর নারীগণ অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন কামনা বিহীণ অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয় সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকগণ ব্যাতীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।’’(২৪:৩২)

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত সব অনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পরিনাম কি

ভয়ংকর হতে পারে তা আমি ইতিপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি। আমরা দেখেছি যে, আপাত: দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত অপরাধের ফল নারীকেই এককভাবে ভোগ করতে হয়েছে বেশি। তাই ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই বারণ করেনি, অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে করে অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না পারে। ইসলাম মনে করে '' Prevention is better than the cure '' অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর।

নারীদের কাছে ইসলাম এটাই প্রত্যাশা করে যে, তারা শালীন সম্ভ্রমশীল পোশাক পরিধান করবে। তাদেরকে এই উপদেশও দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এমনভাবে চলা-ফেরা না করে, যার দরুন অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের উপর কুদৃষ্টি দিতে পারে। কসমেটিকস্ লাগাতে বা অলংকারাদি পড়তে বারণ করা হয়নি; বরং যা করতে বলা হয়েছে, তা হলো, ওর দ্বারা যেন গায়ের মাহরেম বা পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়।

একজন নারী যিনি তাঁর পোশাক ও চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলী বা 'হিজাব' পালন করে থাকেন তিনি সাধারণত: অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হন না। এই ভাবে একজন মুসলিম নারী 'হিজাব' বা পর্দা পালনের মাধ্যমে সেইসব অনেক সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন, যা আজ পশ্চিমা জগতের নারীরা অহরহ মোকাবিলা করছেন।

ইসলাম নি:সন্দেহে পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে , যার ফলে, একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দে তার কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান করেছে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকব যে, পর্দা বা হিজাব পালনকারী একজন নারী অধিকতর নিরুদ্বেগ ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করে থাকেন। এটা এ কারণে যে, আত্ম-মর্যাদাশীল নারী হওয়ার জন্য ইসলাম দৈহিক অবয়বের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে।

একজন মুসলিম নারী তাঁর প্রতিভা ও মননশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এজন্য তাকে কোনরূপ শারীরিক সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, বাজারের পন্য হিসাবে বিবেচিত হতে হয় না। একই সাথে একজন নারী সঠিকরূপে হিজাব বা পর্দা পালনের মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বও পালন করে থাকেন। কেননা ইসলাম কেবল ব্যক্তির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেনা, বরং সমাজের কল্যাণের জন্যও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। আর এক্ষেত্রে পর্দাপ্রথা সমাজের নৈতিক পরিস্থিতিকে সুরক্ষা করে থাকে। একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব কেবল স্ত্রী, মাতা বা কন্যা হিসাবেই নয়, বরং সমাজে নৈতিকতার মানদন্ড রক্ষায়ও পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান র‍াখতে পারেন। আর এইভাবে একজন পর্দানিশীল মুসলিম নারী নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করে থাকেন।

সবশেষে হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে (রাহেঃ)-এর একটি উদ্ধিৃতি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Islam's Response to Contemporary Issues" থেকে প্রদান করছি। হুজুর (রাহেঃ) বলেন, "ইসলামের মতে, নারীকে অবশ্যই যথেচ্ছ ব্যবহার করা এবং ভোগের সামগ্রীরূপে ভুমিকা পালন করা থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের হাতে অবশ্যই এমন যথেষ্ট সময় থাকতে হবে, যাতে তারা তাদের গৃহের প্রতি যে দায়িত্ব এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যে দায়িত্ব তা পালন করতে পারে।" (৯৩ পৃষ্ঠা)

অতএব, আমি একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পরি যে, পর্দা মোটেও পশ্চাদপদতা বা নারীকে শৃঙ্খলিত করার কোন পন্থা নয়। বরং পর্দা নারীকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন করেছে। পশ্চিমা বিশ্বে আহমদী মহিলাগণ প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও পর্দা পালন করছেন। পর্দা পালন করেও উচ্চ শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করছেন। আদর্শবানকে মানুষ সব সময়ই সম্মানের চোখে দেখে থাকে। অতএব, স্বীয় আদর্শকে একবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আর কোন সমস্যার অবকাশ থাকেনা। আমাদের প্রয়াত ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ্ রাবে (রাহঃ) এবং আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খাসেম (আইঃ) আহমদী মহিলাগণকে পর্দা পালনের দিকে বিশেষ তাগিত প্রদান করেছেন। একজন আহমদী হিসাবে প্রত্যেক আহমদী মহিলার খলিফার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তা'লা সংশ্লিষ্ট সবাইকে পর্দার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে তা পালন করার শক্তি দান করুন, আমীন।

[আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৩তম সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে কিছু সংযোজিত ও পরিবর্দ্ধিত]

আহমদ তবশির চৌধুরী

তথ্য সূত্র : হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে (রাহেঃ) রচিতও Islams Response to Contemporary Issues'

: মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী রচিত 'কালে কালে কাল গণনা- যুগে যুগে নারী'

: www.islamiska.org/e/chap2htm

: www.alislam.org/books/pathwaytoparadise/LAJ-chap4.htm

: দৈনিক জনকণ্ঠ

জামাত সমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২৫তম সালানা জলসা ’২০০৭ সফলতার সাথে সম্পন্ন

গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারা ২০০৭রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২৫তম সালনা জলসা ২০০৭ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ’০৭ বাদ জুমআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রগ্রাম অনুযায়ী বিকাল ৪ঃ৩০ মিঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপবিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এস এম তারিকুল ইসলাম, কায়েদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবন। নযম (উর্দু) পেশ করেন জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। মোহতরম সভাপতি, উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান শেষে দোওয়ার মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন, জনাব জিএম, সাব্বির আহমদ MTA সেক্রেটারী সুন্দরবন। আহমদীয়াতের সত্যতা ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে বিদেশী অতিথি মোহতরম হামিদ মুনির নায়েব আমীর ইউ, এস, এ এবং মোহতরম জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া ইউ,এস, এ এবং বক্তব্য রাখেন। বিদেশী অতিথি মোহতরম ওয়াসিম বাকলে জামান ও মোহতরম সাঈদ আহমদ সৌদী আরব জলসায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬:০০ মি: পর্যন্ত চলে। সন্ধ্যায় মাগরিব ও এশা জমা করা হয়। নামায শেষে সন্ধ্যা ৭:০০ মি: থেকে রাত ৮:০০ মি: পর্যন্ত M.T..A এর মাধ্যমে হুযূর (আইঃ)-এর প্রদত্ত জুমআর খুতবা প্রদর্শন করা হয়। রাত্র ৮:১৫ মি: থেকে তবলীগি সভা শুরু হয় সভার শুরুতে নিজ রচিত বাংলা নযম পেশ করেন জনাব জিএম, সিরাজুল ইসলাম। তবলীগি সভায় আহমদীয়াতের পরিচয় তুলে ধরেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। এরপর অত্র এলাকার অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোহতরম মিশনারী ইনচার্জ সাহেব। যাহা শেষ করতে রাত্র ১১:৩০ মি: প্রায় প্রয়োজন হয়। তবুও প্রশ্ন যেন শেষ হবার নয়।

প্রকাশ থাকে যে বিদেশী অতিথিদেরকে সাথে নিয়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সকালে মুন্সিগঞ্জ বন বিভাগ হতে সরকারী পারমিট নিয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন সফরে গিয়েছিলেন। সফর শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের মসজিদ বাইতুস্ সালামে জুমা নামায আদায় করেন।

পরের দিন শনিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী ’০৭ সকাল ১০:০০মি: থেকে ১২:০০ মিঃ লাজনা ইমাইল্লাহ্র Inter action Session (মত বিনিময় অনুষ্ঠান) হয়। পরে বিকাল ৪:৩০ মি: প্রগ্রাম অনুযায়ী সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়া খারাপ (মেঘবৃষ্টি) হওয়ায় অনুষ্ঠান বিলম্বে শুরু হয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করেন। বিকাল ৫:০০মি: সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের আমীর মোহতরম এস এম আব্দুল মজিদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এম এম ইকবাল হোসেন। এরা দু’জন ওয়াকফে নও মুজাহিদ। বক্তৃতা পর্বে বাংলাদেশের পেক্ষাপটে সত্যের বিরোধিতা, এ বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ। কেন আমি আহমদী এবং কি করে আহমদী–এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন বিদেশী অতিথি মোহতরম হামিদ মুনির সাহেব, ইউ,এস,এ। বক্তব্যে জানা গেল খৃষ্ট ধর্ম ছেড়ে এখন থেকে ৫০ বৎসর পূর্বে আহমদীয়া জামাতে বয়াত গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকাতে নায়েব আমীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বক্তৃতা পর্ব শেষে দোওয়ার জন্য এলান সমূহ পড়ে শুনান জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান। এলান শেষে মোহতরম সভপতি সাহেব জলসা ’০৭ এর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন ও আগত সকল মেহমানদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় মাগরিব ও এশা নামায জমা করা হয়। নামায শেষে প্রতি দিনের ন্যায় প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা নযম পেশ করেন মোয়াল্লেম জনাব জিএম, খালিদ বিন সৈয়দ শিক্ষানবিশ মোবাশ্বের কোর্স। প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান পরিচালনা ও উত্তর প্রদান করেন সকলের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মোহতরম আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও বিদেশী মেহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নকারীর অনুরোধে বিদেশী মেহমানগণ বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করেন। এই মহতী জলসাতে পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ১৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

–মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান

চট্টগ্রাম বিভাগের ৬ষ্ঠ বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস '০৭

অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদনক্রমে গত ৩০/০১/০৭ইং হতে ০৩/০২/০৭ইং পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপি ৬ষ্ঠ বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস '০৭ চট্টগ্রাম বিভাগ-১ আহমদীয়া মসলিম জামাত, ব্রক্ষ্মণবাড়ীয়ায় মৌড়াইলস্থ মরহুম সৈয়দ সালেহ আহম্মদ ও মরহুম ডাঃ আনোয়ার হুসেন সাহেবের বাড়িতে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ)

উক্ত মহতী ক্লাসে চট্টগ্রাম বিভাগ-১ অঞ্চলের ১০টি জামাত, জামাত সমূহের নাম হলো ঃ বি-বাড়ীয়া, ঘাটুরা ক্রোড়া, আখাউড়া, বিষ্ণুপুর, তালশহর, দূর্গরামপুর ও জামালপুর থেকে ৭২ জন ওয়াকফে নও ৩০ জন পিতা মাতা উপস্থিত থেকে ৫ দিন ব্যাপী ক্লাস করেন। ক্লাসের উপস্থিতির হার ছিল ৯৫%। উপস্থিত ছাত্রদের ৫টি গ্রুপে ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবে পাঠদান করা হয়। শিশুদের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন মোহতরম মৌলানা মোহাম্মদ সোলেমান, মোবশ্বের মুরব্বী, মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মোহতরম এনামুল হক রনী মোয়াল্লেম, মোহতরম ছাদেক আহমদ মোয়াল্লেম, মোহতরম মোজাফফর আহমদ মোয়াল্লেম, মোহতরম সিদ্দিক আহমদ খালেদ, মোহতরম মসুদ আহমদ পারভেজ রানা ও মোহতরম এস এম এরফান আহমদ ও মৌশাদ আহম্মদ। পাঠদানের বিষয় ছিল নাযেরা কুরআন, হাদীস, নামায, বক্তৃতা শিক্ষা, উর্দ্দু শিক্ষা, দ্বিনী মালুমাত ও সিলসিলার কিতাব। ক্লাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল উর্দু শিক্ষা। ক্লাস শেষে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মাঝেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উক্ত ক্লাসে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভপতি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে মোহতরম মোঃ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া ও মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান সাবেক জয়ীমে আলা, ঢাকা। অভ্যর্থনা ও শুকরিয়া সহ গত বৎসরের রিপোর্ট পেশ করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও, চট্টগ্রাম বিভাগ। ওয়াকফে নও কি এবং কেন? এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মৌলানা মোঃ সুলাইমান, মুবাশ্বের মুরব্বী। এছাড়া নছিহত মূলক বক্তব্য রাখেন খন্দকার সাঈদ আহমদ, সাবেক আমীর বি-বাড়িয়া।

৫দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাসে সার্বিক সহযোগিতা সহ পরামর্শ প্রদান করেন মোহতরম আমীর সাহেব বি-বাড়িয়া জামাত। এছাড়া বৃহত্তর বি-বড়িয়া জেলা কায়েদ ও স্থানীয় কায়েদ ১৫ জন খাদেম সহ ক্লাসে আগতদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। মরহুম সৈয়দ ছালেহ আহমদ ও মরহুম ডাঃ আনোয়ার হোসেন তাহাদের বাড়ী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বাড়ী সমূহের আহমদীরা আগত মেহমানদের রাতের থাকার জন্য তাদের ঘর ও বিছানাপত্র ছেড়ে দেন। এছাড়া স্থানীয় লাজনা বোনেরা ওয়াকফে নওদের সকালের নাস্তা (রুটি) তৈরী সহ দুপুর ও রাতের খাবার রান্নার দায়িত্ব পালন করেন। ক্লাসে আগত ওয়াকফে নওদের খেদমতে নিয়োজিত উল্লেখিত সকলের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

–মোস্তাক আহমদ খন্দকার,
বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও,

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-১ এর মিলন মেলা-২০০৭ অনুষ্ঠিত

২৬শে মার্চ ২০০৭। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-১ আয়োজিত আনসারুল্লাহ্'র মিলন মেলা-২০০৭ ভাওয়াল রাজবাড়ীর অনতিদূরে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

(ন্যাশনাল পার্ক)-এর ভাবগম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দু'টো বড় সাইজের বাস, ৩টি মাইক্রোবাস ও ১টি প্রাইভেট কারযোগে আনসার, আতফাল ও খোদ্দাম কর্মী বাহিনীসহ প্রায় ৭৫ জনের একটি কাফেলা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। অত:পর ব্যক্তিগত আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বের পর ৪/৫ জনের গ্রুপ করে বন পরিদর্শন করা হয়। যথাসময়ে যোহর আসর নামায (কসর) জমা আদায় করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে রান্না করা স্বাস্থ্যসম্মত আইটেম দিয়ে দুপুরের আহার সমাপনান্তে শুরু হয় অনুষ্ঠানের পরবর্তী অধ্যায় তবলীগ ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোযোগ নিবদ্ধকারী এ পর্ব চলে দীর্ঘ সময় ধরে। এরপর স্বল্প পরিসরে কিছু খেলাধুলা ও অলিম্পিক ষ্টাইলে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন অনুষ্ঠানে এনে দেয় নতুন চমক। এছাড়া দু'জন প্রবীণ আনসারকে পুরস্কৃত করা হয় মিলন মেলা-২০০৬ এর অনুকরণে। অত:পর শেষ বসন্তের পড়ন্ত বিকেলে আবারও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অত্যন্ত প্রাণবন্ত, উপভোগ্য ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আনসারুল্লাহ্ মিলনমেলা-২০০৭ অনুষ্ঠিত হলো। মিলন মেলা উদযাপন কমিটির নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও মোহতরম যয়ীমে আ'লা শফিক আহমদ সাহেবের দক্ষ নেতৃত্বে এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ ফযলের বারি বর্ষণে সিক্ত হয়ে আনসারুল্লাহ্'র মিলন মেলা-২০০৭ সার্বিকভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা এ অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন!

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মোন্তাযেম উমুমী

বিভিন্ন জামাতে ও অংগ সংগঠনে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর যথাযোগ্য মর্যাদায় শান ও শওকতের সহিত হযরত মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম এডঃ তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ওমর আহমদ আদর। সভায় নযম পাঠ করেন জনাব আজহারুল ইসলাম রবিন। মুসলেহ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযিঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, সর্বজনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, মঈন উদ্দিন আহমদ, রফি উদ্দিন আহমদ , মোয়াল্লেম নিজামুদ্দিন আহমদ, নাজমুল আলম রোমেল। ৯৮ জন দর্শক শ্রোতা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সবুজ ব্যাজ ধারনপূর্বক সবাই অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন। সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ও মিষ্টি আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আহমদ আলী, জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর

গত ২১/০২/০৭ইং তারিখ বাদ আসর প্রেসিডেন্ট মহিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয় আলহামদুলিল্লাহ। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আতাউর রহমান মৌন, জায়েদুল কাদের সাহেব, সিকদার নাসের আহমদ, জনাব শামসূল ইসলাম (মোয়াল্লেম) সাহেব প্রমুখ। পরিশেষে দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। সভাশেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাসেরাবাদ

গত ২০/০২/০৭ ইং তারিখ বাদ আসর মুসলেহ্ মাওউদ দিবস আল্লাহ্ তাআলার ফযলে উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনে সভাপতিত্ব করেন অত্র জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন মজিদ থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুজিবুর রহমান নযম পাঠ করেন এ, এইচ এক জহির উদ্দিন বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক, জনাব এ এইচ এম জহির উদ্দিন মোয়াল্লেম, দেলোয়ার হোসেন এবং পরিশেষে সভাপতি বক্তব্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়া

গত ২০/০২/২০০৭ তারিখ বাদ আসর মোহতরম প্রেসিডেন্ট খন্দকার আজমল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন বিষয়ক এক অুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোজফফর আহমদ সুমন এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ হাসিবুল হক। অনুষ্ঠানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর

প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক অবকাঠামো ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক, ইসলাম প্রচারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর অবদান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন যথাক্রমে স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, মুবাশ্বের মুরব্বী জনাব মোহাম্মদ নওশাদ আহমদ এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট খন্দকার আজমল হক সাহেব।

অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপস্থিত ছিল মোট ১৮ জন।

–মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর

স্থানীয় জামাতের উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী/০৭ বাদ মাগরিব আহমদনগর জামে মসজিদে স্থানীয় সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব মোহাম্মদ তাহের সাহেবের সভপতিত্বে মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাবিদ আহমদ (লিমন)। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব শের আলি। মুসলেহ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব ডাঃ ইসমাইল বোখারী সাহেব, জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। জনাব জুবায়ের আহমদ বিপুর নযম পেশ করেন। শেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সর্বমোট ১৩৩ জন আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। খাকসার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করি।

মহিউদ্দীন আহমদ
এ্যডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ , চট্টগ্রাম

গত ৯ই মার্চ বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস পাঠ ও নযমের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদের কর্মময় জীবনের উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য প্রদান করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৭০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

–রোকসানা বেগম,
ইশায়াত সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুর

মহান আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে গত ১৬/০৩/০৭ইং স্থানীয় মসজিদে 'মুসলেহ্ মাওউদ' দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। দোয়া, কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এতে উপস্থিতির সংখ্যা ১৮ জন ছিল। অনুষ্ঠানটি দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়। **–আনোয়ারা সিকদার,** প্রেসিডেন্ট

লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ

গত ৯ই মার্চ বাদ জুমা মুসলেহ্ মাওউদ দিবস আল্লাহ্ তাআলর ফজলে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে পালন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভনেত্রীত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলা ও উর্দু ও নযম আবৃত্তি করেন আয়েশা সিদ্দিকা (বিপাশা) খাওলাদিন উপমা। উক্ত দিবসের উপর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন মিস সুফিয়া বেগম, মিসেস উম্মে কুলসুম (চায়না), মিসেস শিমুল আহমদ ও মিসেস রোকেয়া বেগম।

সাভনেত্রীর ভাষণ প্রদান করেন মোহতরমা দিলরুবা বেগম মায়া। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়া ও আপ্যায়ণের মাধ্যমে এই মহান মুসলেহ মাওউদ দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

–উম্মে কুলসুম

এসব স্থানীয় জামাত ছাড়াও আরো স্থানীয় জামাতে এ মহান দিবস উদযাপিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবগুলো সংবাদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় আমরা দুঃখিত–সম্পাদক

অহমদীয়া মুসলিম জামাত গাজীপুরে "আল ওসীয়্যত" বই-এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৩/০২/০৭ইং তারিখে বাদ জুমআ অহমদীয়া মুসলিম জামাত গাজীপুরস্থ মসজিদে প্রেসিডেন্ট মহিবুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে "আল ওসীয়্যত" পুস্তকের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত করেন আতাউর রহমান মৌন-ওয়াকফে নও। "নেযামে ওসীয়্যত"-এর গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয় এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জনাব কবির আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী। ওসীয়্যতের আরও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন জনাব আল-মাহমুদ সাহেব, জনাব শামসুল ইসলাম সাহেব (মোয়াল্লেম) এবং জনাব মশিউর রহমান সাহেব। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উক্ত মহতী সভার সমাপ্তি হয়।

কবির আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী

শোক সংবাদ

☐ সামসুল হক (মাষ্টার) সাহেবের ইন্তেকাল

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমার পিতা জনাব সামসুল হক (মাষ্টার) গত ০৩/০৩/০৭ ইং বিকেল ৪.০০ ঘটিকার সময় তাঁর নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তিনি ৪ পুত্র দুই কন্যা ভাই বোন, নাতী নাতনী ভাতিজা ভাগনী সহ বহু গুণগ্রাহী ও ছাত্র/ছাত্রী রেখে গেছেন। তাঁকে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে (শ্যামপুর জামাতের মিরপুর গ্রাম) দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য মরহুম আমেরিকা প্রবাসী জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের বড় ভাই এবং রিজিওনাল কায়েদ ফিরোজ আহমদ সাহেবের পিতা। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে যেন বেহেশত নসীব করেন এবং আমাদেরকে সবরে জামিল প্রদান করেন সেজন্য সকলের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

–**ফিরোজ আহমদ**, রিজিওনাল কায়েদ

☐ আলী আহমদ লস্কর সাহেবের ইন্তেকাল

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরার প্রবীন আহমদী জনাব আলী আহমদ লস্কর গত ০৫/০৩/০৭ইং তারিখে রাত ৭:৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তিনি কিছুদিন যাবত জন্ডিস রোগে ভোগছিলেন। আরো উল্লেখ থাকে যে, তিনি ১৪ বৎসর যাবত মক্তব মাষ্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বৎসর। তিনি মৃত্যুকালে ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে কয়েকজন নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ ও মুখলেছ আহমদী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জামাতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা কেবল পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলাই পূর্ণ করে দিতে পারেন। ০৬/০৩/০৭ইং তারিখে জানাযা শেষে মরহুমের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পরিবার বর্গকে সাব্‌রে জামীল দান করুন।

–**মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ**
মোয়াল্লেম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের (২০০৬ থেকে ২০০৮)মজলিসে আমেলার সদ্য অনুমোদন প্রাপ্ত সদস্যা ও পদের নামের তালিকা

নং	নাম	পদবী
১	মোহতারেমা ইশরাত জাহান	সদর
২	মোহতারেমা আমাতুল কাইয়ুম	নায়েব সদর-১
৩	মোহতারেমা সাদেকা হক	নায়েব সদর-২ ও সেক্রেটারী সেহেত-ই-জিসমানী
৪	মোহতারেমা মাহমুদা আখতার	জেনারেল সেক্রেটারী
৫	মোহতারেমা মোবারেকা জাহান	সেক্রেটারী মাল
৬	মোহতারেমা মালিহা রাহনুমা	সক্রেটারী তালিম
৭	মোহতারেমা মিসমাতুন্নেছা	সেক্রেটারী তরবীয়ত
৮	মোহতারেমা মিসেস রেহেনা খায়ের	সেক্রেটারী তাজনীদ
৯	মোহতারেমা খালেদা নাজমুল	সেক্রেটারী তবলীগ
১০	মোহতারেমা কামরুন্নেছা	সক্রেটারী নাসেরাত
১১	মোহতারেমা রওশন জাহান	সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াফে জাদীদ
১২	মোহতারেমা গুল জান্নাত	সেক্রেটারী খেদমতে খালক্
১৩	মোহতারেমা সৈয়দা শওকত জাহান	সেক্রেটারী সানাত ও দাস্তকারী
১৪	মোহতারেমা মরিয়ম সুলতানা	সেক্রেটারী নও মোবাইয়্যানাত
১৫	মোহতারেমা শাহিনা হাকিম	সেক্রেটারী জিয়াফত
১৬	মোহতারেমা শাহরীন সুলতানা	মোবাসিবা মাল
১৭	মোহতারেমা জেবিন হোসেন	সেক্রেটারী ইশায়াত
১৮	মোহতারেমা আমাতুল হায়ী	সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী-১
১৯	মোহতারেমা আবিদা সুলতানা	সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী-২
২০	প্রেসিডেন্ট লাজনাইমাইল্লাহ্ , ঢাকা	সদস্যা
২১	মোহতারেমা লায়লা রহমান	সম্মানিত সদস্যা
২২	মোহতারেমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী	সম্মানিত সদস্যা

নব-নিযুক্ত আমেলার সদস্যাগণ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী যেন স্বীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতে সক্ষম হোন সেজন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি।

ইশরাত জাহান
সদর

খেলাফত সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

৩১মে, ২০০৭ প্রকাশিতব্য 'পাক্ষিক আহমদী'-র সংখ্যাটি 'খেলাফত সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ্! এ সংখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌গণের জীবনী ও খেলাফত কালের তাৎপর্যবহ বিষয়াদির উপর লিখা আহ্বান করা হচ্ছে। –সম্পাদক

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

“আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা’বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা’তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের ‘ইজমা’ অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা’তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?”

‘লা ইকরাহা ফিদ্দীন’
ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই।
২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

“আলা ইন্না লা’নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা”

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

“আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা’ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।” (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

“আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা ‘মধ্যবর্তী যোজক’ এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।”

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিঁড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিঁড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

FIAT
FUJICOLOR
COLOR

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

New Vol. No. 69 ■ 18th Issue
Fortnightly

The AHMADI

31 March, 2007. ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা, রাজশাহী-২অঞ্চ
2nd Regional Salana Jalsa, Rajshahi-2 Regio
হমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেবাড়ীয়া, নাটোর, ১৬ই ম
ya Muslim Jama't, T aria, Nato 16 h Ma

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, Nation
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 e-mail: amgb@bol-online.c